Mamun Academy

কাঠগড়ার মানুষ

(তৃতীয় খণ্ড)

রাজশাহী ডিভিশনের অবসরপ্রাপ্ত
স্পেশাল জজ

মোঃ মুমিনুর রহমান

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৮৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদেত চৌধুরী

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
দুরালাপনী : ৪০৫৩৩২
জি, পি,ও বক্স নং ৮৫০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১

Kathgarar Manush-3
A collection of important sensational cases.
Collected, edited and translated by
Md. Muminur Rahman. Spl. Judge (Retd.)

Mamun Academy

কাঠগড়ার মানুষ

(তৃতীয় খণ্ড)

মোঃ মুমিনুর রহমান

Mamun Academy

সূচী

ভূমিকা ৭

সালেহা হত্যা রহস্য ৯

গ্যাস চেম্বারের খুনী ২২

ক্ষতিপূরণ ৩৯

নীহার বানু হত্যা ৫০

গিলোটিন ৬৮

স্মাগলার ৮৩

নরমাংসের কসাই ৯৩

অতৃপ্ত বাসনা ১০৪

নৈশ ক্লাবের ট্র্যাজেডী ১১৭

ধর্ম বনাম বিজ্ঞান ১৩৩

অনিল পাণ্ডের হত্যা ১৫১

পাপের প্রায়শ্চিত্ত ১৬৩

অবৈধ প্রেমের শিকার ১৮৩

ডাকাত রাণী ফুলন দেবী ১৯৩

Mamun Academy

ভূমিকা

'কাঠগড়ার মানুষ' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড বেরুবার পর সুধী পাঠক সমাজের কাছ থেকে অসংখ্য অনুরোধ এসেছে বইটির আরও খণ্ড বের করার জন্যে। তাঁদের আগ্রহে অনুপ্রাণিত হয়েই তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের এই উদ্যম।

অপরাধ জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, নারী যেখানে পণ্য, পুরুষ যেখানে হিংস্র, জীবন সেখানে বিপদ ও অনিশ্চিয়তার তুফানে কম্পমান। ভোগ যেখানে লক্ষ্য, হিংসা সেখানে আসে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে।

দেশ-বিদেশের অপরাধ ইতিহাসে মানবজীবনের ভাঙাগড়ার খেলার শত শত বিচিত্র কাহিনী ছড়িয়ে আছে যা কল্পনাকেও হার মানায়। তারই অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে আরও কয়েকটি সত্য ঘটনা এই খণ্ডে সন্নিবেশিত করা হলো।

প্রথম দু'খণ্ডের মতো এটিও পাঠক সমাজে আদৃত হলে আমার শ্রম সার্থক বিবেচনা করবো। ভবিষ্যতে অনুরূপ আরও কাহিনী প্রকাশের আশা রইলো।

মুমিনুর রহমান

৫-৬-৮৩

হেনা ভিলা

খালদার রোড, যশোহর।

Mamun Academy

সালেহা হত্যা রহস্য

Mamun Academy

যশোহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী জনাব মমতাজুল করিম ওরফে মঞ্জু মিয়ার ছিল সাত পুত্র-সন্তান ও একমাত্র কন্যা সালেহা ওরফে খুকী। মেয়েটি ছিল বাপ মায়ের প্রাণপ্রিয় দুলালী ও সাত ভাইয়ের এক-মাত্র আদরের বোন। জন্ম থেকেই আদর ও প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত সালেহার বিয়ে ঠিক হলো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র ইকবালের সঙ্গে। ১৯৭৫ সালের ৭ই ডিসেম্বর মহা ধুমধামে তার বিয়ে দেয়া হয় সুদর্শন যুবক এহতেশামুদ্দীন ওরফে ইকবালের সঙ্গে। মেয়ের বাবা-মার আশা, জামাই ভবিষ্যতে বড় ডাক্তার হয়ে অর্থ, যশ, সম্মান সবকিছুরই অধিকারী হবে। একমাত্র আদরের কন্যার ভবিষ্যতের ঐ সুখ-স্বপ্নে তখন তাঁরা বিভোর। বিয়ের সময় তাঁরা প্রচুর যৌতুক দেন জামাইকে। এর মধ্যে ছিল একশত ভরি সোনা, একটি নতুন ডাটসান গাড়ি, টি. ভি সেট, টেপ রেকর্ডার ও নগদ তিন লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা। ঢাকা শহরে মালিবাগ চৌধুরী পাড়ায় ইকবালের একখণ্ড জমি ছিল। সেখানে একটি বাড়ি তৈরির জন্য ইকবালের চাপে সালেহার মা জামাইকে দেড় লাখ টাকাও প্রদান

করেন। সেই বাড়িতেই ইকবাল স্ত্রী সালেহা ও মা সৈয়দা বেগমকে নিয়ে বসবাস করতো। মনোয়ারা নামে এক যুবতী কাজের মেয়েও সে-বাসায় থাকতো। ছাত্রাবস্থায় ইকবাল সৌখিন জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। বিয়ের পর শ্বশুরের দেয়া গাড়ি হাকিয়ে সে কলেজে যাতা-য়াত করতো। তার ড্রাইভারও সেই বাড়িতে থাকতো—নাম মুন্সী আনোয়ার হোসেন।

বাপ মায়ের দেয়া এতো যৌতুক, টাকা পয়সা, গাড়ি, বাড়ি কিছুই কিন্তু শান্তি বয়ে আনতে পারেনি মেয়ের জন্য। স্বামীর সন্দে-হজনক চরিত্র সবসময় সালেহার মনে কাটার মতো বিঁধতো। পারস্পরিক বিশ্বাস ও সৌহার্দ্যের ওপরই প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক নির্ভরশীল। একজনের হঠকারিতায় সেই বিশ্বাসে যখন চিড় ধরে তখন বিবাহের স্বর্গীয় সুখ নরকের দাবানলে পরিণত হয়। ধনীর দুলালী সালেহার অল্পদিনের জীবনগাথা তারই এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

১৯৭৮ সালের ১৮ই এপ্রিল দুপুর দুটোর দিকে ইকবালের বাসার কাজের মেয়ে মনোয়ারা ও ড্রাইভার মুন্সী আনোয়ার তাদের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ চিৎকার করে বলতে শুরু করে, 'খুকী আপা সুইসাইড করেছে, আপনারা তাড়াতাড়ি আসুন।' পাশের বাড়িতে গিয়েও মনোয়ারা এই খবর দেয়। ওদের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীদের কয়েকজন দ্রুত ঐ বাসায় আসে এবং দেখতে পায় সালেহার মৃতদেহ নিশ্চল পড়ে আছে তাদের বেডরুমের মেঝের ওপর। সদ্য মৃতা যুবতী স্ত্রীর লাশের পাশে দাঁড়িয়ে তার স্বামী ইকবাল স্বাভাবিক কণ্ঠে সালেহার আত্মহত্যার(?) কাহিনী বর্ণনা করে যাচ্ছিল উৎসুক আগন্তুকদের কাছে। এই সময় ইকবাল সালেহার

Mamun Academy

শাড়ীর ভাঁজ থেকে একটি রক্তমাখা ব্লেড বের করে সবাইকে দেখিয়ে বলে,'সর্বনাশ ! সালেহা এই ব্লেড দিয়ে আত্মহত্যা করেছে !' সে তার ভাই বাবুলকে পাঠায় তাদের পারিবারিক চিকিৎসক মালিবাগের ডাঃ আব্দুর রশিদকে ডাকতে। তারপর দৌড়ে যায় টেলিফোনের কাছে।

ফরাশগঞ্জে সালেহার ভাই শাহিদুল করিমের ফোন বেজে উঠলো —ফোন ধরতেই ভেসে এলো ইকবালের কণ্ঠস্বর। স্তম্ভিত করিম শুনলো এক পরম দুঃসংবাদ—'সালেহা আত্মহত্যা করেছে। শিগগির আসুন।' শাহিদুল সঙ্গে সঙ্গে তার পিতাকে জানালো এই মর্মান্তিক খবর। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ওরা এসে পৌঁছুল মালিবাগে ইকবালের বাসায়। দেখলো সালেহা তাদের বেডরুমের কার্পেটের ওপর মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ইকবাল সেখানেই ছিল। ঘটনা সম্বন্ধে শ্বশুরকে সে যা বললো তা এরকম : সেদিন দুপুরে মেডিক্যাল কলেজ থেকে ফিরে সে দেখে সালেহা আত্মীয় বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ফিরে এসেছে। আত্মীয়ার অসুস্থ বাচ্চা ডেইজীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করে ইকবাল গোসল করতে বাথরুমে ঢোকে। গোসল সেরে এসে দেখে বেডরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। সে দরজায় কড়া নাড়লে সালেহা ভেতর থেকে তাকে দেরি করতে বলে। ইকবালের মা সৈয়দা বেগমও ইকবালকে অপেক্ষা করতে বলে, কারণ সালেহা বোধহয় ভেতরে শাড়ি পাল্টাচ্ছে। মিনিট দশেক পরেও যখন দরজা খুললো না তখন ইকবাল ড্রাইভার আনোয়ারকে ডেকে দুজনে মিলে একটি লম্বা কাঠের টুকরো ও ঘর পরিষ্কার করার ফুলঝাড়ুর হাতলের সাহায্যে বেডরুম ও ড্রইংরুমের মধ্যবর্তী দরজাটা খুলে ফেলতে সক্ষম হলো, তারপর ঘরে ঢুকেই তারা সবিস্ময়ে দেখতে পেল সালেহা নিশ্চল অব-

Mamun Academy

স্থায় কার্পেটের ওপর বসে আছে—তার হাত দুটো সামনে ঝুলছে। ইকবাল তাকে ধরতেই সে কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। দেখা গেল ওর গলায় গভীর ক্ষতচিহ্ন। একটি ব্লেডও পাওয়া গেল সেখানে।

মেয়ের আত্মহত্যা সম্পর্কে ইকবালের এই বিবরণ হতবাক পিতার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলো। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার আবদুর রশিদ, তাঁকে সালেহার পিতা জিজ্ঞেস করলেন,'এটা কি সম্ভব—এতটুকু একটা ব্লেড দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করা? আর গলা কাটার পরও কি তার পক্ষে ঐভাবে বসে থাকা সম্ভব?' এ প্রশ্নের কোনো উত্তর ডাক্তার সেদিন দেননি।

এর আগে ইকবালের নির্দেশে তার ছোট ভাই বাবুল তাদের পারিবারিক ডাক্তার মালিবাগের ডাঃ আবদুর রশিদের কাছে ছুটে গিয়ে বলে—'আমার ভাবীর ওপর সম্ভবত জিনে আছর করেছে, তার গলা টিপে মারাত্মক জখম করে দিয়েছে, আপনি তাড়াতাড়ি আসুন।' ডাক্তার সাহেব আনুমানিক আড়াইটার সময় ইকবালের বাসায় আসেন ও সালেহার মৃতদেহ মেঝেতে দেখতে পান। মৃতদেহের অবস্থা এবং গলার ক্ষত দেখে ডাক্তার অনুমান করেন যে ব্লেডের সাহায্যে ওভাবে আত্মহত্যা করা সম্ভব নয়। আর সেজন্যেই ইকবালের একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাকে সালেহার 'ডেথ সার্টিফিকেট' লিখে দিতে অস্বীকৃতি জানান। বাবুল মতিঝিল থানায় গিয়ে একটি'অস্বাভাবিক মৃত্যুর'(U.D) রিপোর্ট দিয়ে আসে। বৈকাল ৬-৩০ মিনিটে পুলিশ এলো। তখন বাসায় ইলেকট্রিসিটি ছিল না। মোমবাতির মৃদু আলোতেই কোনরকমে মৃতের সুরতহাল সেরে পুলিশ লাশটি পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠাবার উদ্যোগ নিল। সেই সময়

Mamun Academy

সালেহার ভাই পুলিশকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলো, পোস্ট মর্টেমের জন্য লাশটি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে না পাঠিয়ে যেন অন্য কোথাও পাঠানো হয়। স্বভাবতই তার মনে সন্দেহ জেগেছিল যে ইকবাল ঐ মেডিক্যাল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র হওয়ায় সেখানে সে প্রভাব বিস্তার করে সঠিক রিপোর্ট পেতে বাধার সৃষ্টি করবে, (তার এই আশঙ্কা পেষ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হয়েছিল) পুলিশ অবশ্য সে-অনুরোধ রাখেনি। সে-রাতেই তারা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে লাশ পাঠালো। রাত ৮ টায় মৃতদেহ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হলো। সে-রাতে লাশকাটা ঘরে ইকবাল সহ তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইন্টার্নী ডাক্তার উপস্থিত ছিল। নিয়ম অনুযায়ী দিবালোক ছাড়া ময়নাতদন্ত (পোস্ট মর্টেম) করা যায় না কিন্তু তবুও এক্ষেত্রে পোস্ট মর্টেম রাতেই করা হয় ও সূর্যোদয়ের পূর্বে রিপোর্ট তৈরি করে সকাল ৬ টার মধ্যেই সালেহার পিতৃকুলের কেউ আসার আগেই তাড়াহুড়া করে লাশ ইকবালের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এই পোস্ট মর্টেম সমাধা করেন ডাঃ মোয়াজ্জেম হোসেন নামের একজন লেকচারার। তিনি ইকবালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এই রিপোর্টে সালেহা বেগমের রহস্যজনক মৃত্যুকে 'আত্মহত্যা' বলে উল্লেখ করা হয়। সেই মর্মে পুলিশের কাছে রিপোর্টও দেয়া হয়।

সকালে লাশ ফেরত নিয়ে এসে, গত রাতের ব্যস্ততার পর আজ ইকবালকে অনেকটা শান্ত মনে হলো। বেলা ১১ টায় গোসল সেরে আসরের সময় জানাজা পড়িয়ে লাশ সালেহার মায়ের কাছে ফরাশগঞ্জে নিয়ে আসা হলো। একমাত্র মেয়ের লাশ দেখে করুণ কান্নায় ভেঙে পড়লো ওর মা। সে শুধু বলতে লাগলো, ইকবালই তার মেয়ের অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী। লাশ দাফনের সময় জুরাইন গোর-

Mamun Academy

এভাবে সমাজের উচু তলার শিক্ষিত কিছু লোক অর্থ ও প্রভাব-বলে এক জঘন্য হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দেয়ার যে হীন প্রচেষ্টা চালায় তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

এই চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার শুরু হয় ঢাকার তৎকালীন ২নং স্পেশাল মার্শাল ল' কোর্টে। দুইজন পদস্থ সামরিক অফিসার ও এক-জন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়ে গঠিত ঐ কোর্টে সরকার পক্ষ থেকে মোট ৪৫ জন সাক্ষী ও বহু আলামত বিচারের সময় উপস্থিত করা হয়।

এই মামলার বিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর সাক্ষ্য দেয় ২৩ নং সাক্ষী মনোয়ারা বেগম। সে-ই ছিল এ-ঘটনার এক-মাত্র প্রত্যক্ষ সাক্ষী। পরিপূর্ণ কোর্টে উৎসুক দর্শকদের সামনে সে তার জবানবন্দীতে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলে, সে আসামী ইকবালের বাড়িতে কাজের মেয়ে (চাকরানী) হিসেবে থাকতো। অবিবাহিত এই মেয়েটির বয়স ছিল ১৪/১৫ বৎসর। রাতে সে ঘুমো-তো ইকবালের বেডরুম সংলগ্ন ড্রইংরুমের মেঝেতে। দুই ঘরের মাঝে ছিল একটি দরজা। ঘটনার প্রায় চার মাস আগে এক রাত্রে ইকবাল ঐ দরজা খুলে ড্রইংরুমে ঢুকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়। ইকবাল সে-রাতে তাকে এই ঘটনা ফাঁস না করার জন্যেও শাসায়। এরপর থেকে তারা উভয়ে মাঝে মাঝে সালেহার অগোচরে যৌনকর্মে লিপ্ত হতো। ঘটনার মাসখানেক আগে সালেহা কিছুদিনের জন্য তার বাপের বাড়ি গিয়েছিল। সে-সময় রাতে মনোয়ারা ইকবালের মায়ের ঘরে থাকতো। সালেহা ফিরে এলে মনোয়ারা আবার ড্রইংরুমে ঘুমোতে শুরু করে। তবে এবার সে মধ্যবর্তী দরজায় ড্রইংরুমের দিক থেকে খিল আটকে

রাখতো, ফলে আগের মতো ইকবাল আর রাতে তার ঘরে আসতে পারতো না।

ঘটনার দিন অর্থাৎ ১৮-৪-৭৮ তারিখে সালেহা মনোয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে সকাল ১০টায় ঢাকায় তার ননদিনীর বাসায় বেড়াতে যায়। ১১টার দিকে সালেহাকে ওখানে রেখে মনোয়ারা একাই বাসায় ফিরে আসে। ইকবাল কলেজ থেকে ফিরে নিচে মনোয়ারাকে একা দেখতে পেয়ে তাকে ডেকে নিয়ে দোতলায় শোবার ঘরে চলে আসে, ও ঘরের দরজা আটকে দিয়ে তার সঙ্গে যৌন সংসর্গের প্রস্তাব দেয়। ঠিই এই সময় ইকবালের মা ছেলের খোঁজে তার বেডরুমের কাছে আসে। মায়ের ডাক শুনে ইকবাল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মার সঙ্গে কথা বলে। সে-সময় মনোয়ারা ভয় পেয়ে ঘরের ভেতরে এক কোণায় লুকিয়ে ছিল। মা চলে গেলে ইকবাল আবার ঘরে এসে দরজা আটকে মনোয়ারার সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়। এর পরপরই বন্ধ দরজায় করাঘাত পড়ে। ইকবাল দরজা খুলে থতমত খেয়ে যায়—দেখে,স্ত্রী সালেহা স্বয়ং দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। সালেহা ঘরে ঢুকে মনোয়ারাকে সন্দেহজনক ভাবে দেখতে পেয়ে ভয়ানক রেগে যায়। সে বুঝতে পারে তার অসাক্ষাতে তার স্বামী দরজা আটকে ওর সঙ্গে কুকার্যে লিপ্ত ছিল। সে রাগতকণ্ঠে এ ব্যাপারে স্বামীর কাছে কৈফিয়ত তলব করে। উদ্ধত ইকবাল উত্তরে বলে, সে যাই করুক না কেন, তা নিয়ে সালেহার মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন নেই। সালেহা তখন চিৎকার করে বলে, সে সবাইকে তার স্বামীর লাম্পট্যের কথা বলে দেবে।

এ সময় মনোয়ারা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু সালেহা তাকে ধরে ফেলে। এটা দেখে ইকবাল রেগে গিয়ে দরজা

আটকাবার কাঠের ডাঁসা তুলে নিয়ে সালেহার মাথায় আঘাত করে। 'মা গো' বলে আর্ত চিৎকার ক'রে সালেহা মেঝের লাল-কার্পেটের ওপরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। ভয়ে মনোয়ারা দৌড়ে গিয়ে তেতলায় সৈয়দা বেগমকে এই ঘটনার কথা বলে। ইকবালের মা মনোয়ারাকে নিয়ে ছুটে আসে ইকবালের ঘরে। মার প্রশ্নের উত্তরে ইকবাল শুধু বলে—সে নিজেই কেবল এর জন্যে দায়ী। সৈয়দা বেগমের নির্দেশে মনোয়ারা মগে করে পানি আনতে লাগলো। সৈয়দা বেগম সেই পানি নিস্তেজ সালেহার মাথায় ঢালতে থাকলো। এভাবে ৫/৬ মগ পানি ঢালার পরেও সালেহার জ্ঞান ফেরার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। ইকবাল সালেহার হাতের নাড়ী টিপে দেখলো কোনো স্পন্দন নেই। তখন সে বললো—সালেহা মারা গেছে। এরপর সৈয়দা বেগম অল্পক্ষণের জন্য তেতলায় গেল। এ সময় ইকবাল ড্রেসিং টেবিল থেকে একটি ব্লেড নিয়ে এসে সেটা দিয়ে সালেহার গলা কাটতে শুরু করলো। এই নিষ্ঠুর কাজে বাধা দেবার জন্যে মনোয়ারা ইকবালের হাত টেনে ধরলো। এতে রেগে গিয়ে ইকবাল মনোয়ারার গালে এক চড় দিয়ে সাবধান করে দিল যে ওর কাজে বাধা দিলে তার পরিণতিও সালেহার মতো হবে। এরপর ইকবাল আবার ঐ ব্লেড দিয়ে সালেহার গলা অনেকখানি কেটে ফেললো। এর মধ্যে ওর মা ফিরে এসে ওভাবে সালেহার গলা কাটা দেখে ইকবালকে তিরস্কার করে বললো, 'জ্ঞান না হয় না হলো, তাই বলে গলা কাটতে গেলি কেন?' ইকবাল নিরুত্তর।

ঘটনার আকস্মিকতায় ভীত সন্ত্রস্ত সৈয়দা বেগম মনোয়ারাকে রান্না ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললো, 'অনেক টাকা দেব তোকে। কিন্তু খবরদার, এই ঘটনা ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে ফাঁস করতে

Mamun Academy

পারবি না।'

ইকবালের আদেশ পেয়ে মনোয়ারা ড্রাইভার আনোয়ারকে সেখানে ডেকে আনলো। ইকবাল আনোয়ারকে বললো—'দুর্ঘটনা যখন ঘটে গেছে,একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে?' উত্তরে আনোয়ার বললো—'এটাকে আত্মহত্যা প্রমাণ করতে হলে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখাতে হবে।' ইকবাল এ প্রস্তাবে সায় দিয়ে দৌড়ে ঘর পরিষ্কার করার একটি ফুলঝাড়ু ও একটি কাঠের টুকরা নিয়ে ঘরের বাইরে চলে এলো। সৈয়দা বেগম ঘরের ভেতর থেকে দরজার খিল এঁটে দিল। এবার ইকবাল ও আনোয়ার ফুলঝাড়ুর বাঁশের হাতলটি অন্য দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে ঐ ঘরের দরজার খিল খুলে ফেলবার একটি মহড়া দিয়ে নিল।

কার্পেট ভিজে যে পানিটুকু মেঝেতে জমে ছিল, মনোয়ারা তা মুছে ফেললো। তারপর ইকবালের নির্দেশ মতো তারা কান্নার সুরে চিৎকার করে বলতে লাগলো, সালেহা আত্মহত্যা করেছে।

ইকবালের সঙ্গে সেদিন সহবাসের পর মনোয়ারা গোসল করেনি। পরদিন সে গোসলের আগে পরিধেয় শাড়ি, পেটিকোট, ব্লাউজ না ভিজিয়ে সৈয়দা বেগমের বাথরুমে রেখে দেয়; ইকবালও ঘটনার পর তার পরিধেয় লুঙ্গি না ভিজিয়ে তার রুমে বদলে রাখে। পরবর্তী সময়ে তদন্তকারী পুলিশ সাক্ষীদের সামনে মনোয়ারার শাড়ি, পেটিকোট ও ইকবালের লুঙ্গি সীজ করে সেসব রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়ে দেখতে পায় যে পুরুষের বীর্যের চিহ্ন রয়েছে উভয়ের কাপড়ে। লুঙ্গিতে ও ব্লেডে মানুষের রক্তের চিহ্নও পাওয়া গেল। মনোয়ারাকে ডাক্তারী পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ১৪/১৫ বৎসরের কুমারী হওয়া সত্ত্বেও সে নিয়মিত পুরুষ সহবাসে অভ্যস্ত ছিল।

আসামী পক্ষ থেকে মনোয়ারা ও অন্যান্য সাক্ষীদের প্রবল জেরা করা হয়। স্পেশাল 'মার্শাল ল' কোর্ট রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট এবং মনোয়ারা, ডাক্তার ও অন্যান্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা ও বিবেচনা করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছেন যে সালেহা আত্মহত্যা করে-নি। তার মাথায় ভারি কাঁচ দিয়ে আঘাত ক'রে, ও পরবর্তী সময়ে ব্লেড দিয়ে তার গলা মারাত্মকভাবে কেটে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এই খুনের কারণ হিসাবে রায়ে বলা হয় যে, বাসার কাজের মেয়ে মনোয়ারার সঙ্গে ইকবালের ঘৃণিত ব্যভিচারে লিপ্ত থাকার সময় হঠাৎ স্ত্রী সালেহার কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়ায়, ঐ লজ্জাকর ঘটনা জানাজানি হওয়ার আশঙ্কা চিরতরে রোধ করার উদ্দেশ্যেই ইকবাল সালেহাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে। উক্ত কোর্টে তিনজনের মধ্যে দুজন বিচারকই ইকবালকে ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে তাকে ৫-৮-৭৮ তারিখের রায়ে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। অন্য দু-জন আসামী ড্রাইভার আনোয়ার ও মা সৈয়দা বেগমকে এই হত্যা-কাণ্ড গোপন করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ড প্রদান করেন। কোর্টের তৃতীয় বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অবশ্য ইকবাল-কে প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। কোর্ট সামরিক আইনের বিধান অনুযায়ী অধিকাংশ বিচারকের প্রদত্ত প্রাণদণ্ডাজ্ঞাদেশ রিভিউ(Review)করার জন্য ২৯-৮-৭৮ তারিখে সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। তৎকালীন বাংলা-দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ২১-৯-৭৮ তারিখে উক্ত প্রাণদণ্ডের আদেশ অনু-মোদন করেন। অতঃপর আসামী প্রাণভিক্ষা করে প্রেসিডেন্টের কাছে ২৭-৯-৭৮ তারিখে এক আবেদন করে। ইতিমধ্যে ৬-৪-৭৯ তারিখে দেশ থেকে 'মার্শাল ল' উঠিয়ে নেয়া হয়। ৮-৬-৭৯ তারিখে

Muktir Academy

ইকবালের পিতাকে সরকার জানিয়ে দেয় যে আসামীর দয়াভিক্ষার আবেদন সরকার অগ্রাহ্য করেছেন।

এরপর ইকবালের পক্ষ থেকে ঢাকা হাইকোর্টে তার প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে একটি 'রিট দরখাস্ত' দাখিল করা হয়। কিন্তু হাইকোর্ট ১৩-৬-৭৯ তারিখের রায়ে প্রাথমিক শুনানীর পরই উক্ত রিট দরখাস্ত বাতিল করে দেন। অতঃপর শেষ চেষ্টা হিসেবে আসামী বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে, হাইকোর্টের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করে। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জাস্টিস কামালউদ্দিন হোসেন সহ সুপ্রীম কোর্টের পাঁচজন মাননীয় বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রীম কোর্টের ফুল বেঞ্চ দীর্ঘ নয়দিন উভয় পক্ষের বক্তব্যের শুনানীর পর ২৭-৩-৮০ তারিখের সর্বসম্মত রায়ে ঐ আপীল ডিসমিস করে দেন।

শোনা যায়, ফাঁসীকাষ্ঠে যাবার আগে ইকবাল তার শেষ ইচ্ছা হিসেবে জানায় : তার কবর যেন সালেহার কবরের পাশেই দেয়া হয়।

Mamun Academy

গ্যাস চেম্বারের খুনী

অপরিমিত লোভ ও অর্থলিপ্সা একজন মেধাবী, শিক্ষিত লোককেও যে কত জঘন্য হত্যাকারীতে পরিণত করতে পারে, তারই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ফ্রান্সের ডাঃ পেটিয়ট মার্সেল। একের পর এক নিরীহ আশ্রয়-প্রার্থী নরনারীদের নির্বিচারে খুন করে, পেটিয়ট গিলোটিনে তার প্রাণদণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত যে অর্থের পাহাড় গড়ে তুলেছিল তার পরিমাণ হবে এক লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশি। তার নিজের স্বীকারোক্তিতে জানা যায়, মোট ৬৩ জন নিরীহ মানুষকে সে তার তৈরি নিজস্ব গ্যাস-চেম্বারে আবদ্ধ করে খুন করেছে; আর প্রতিটি মানুষের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের অশেষ যন্ত্রণার দৃশ্য অসীম উল্লাসে উপভোগ করেছে সে ঐ গ্যাস চেম্বারের নির্দিষ্ট স্থানে পেরিস্কোপ বসানো একটি ছিদ্র দিয়ে।

১৮৯৭ সালে পেটিয়ট মার্সেল ফ্রান্সের অক্রোরী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করে। তার পিতা ছিল একজন সামান্য পোস্টাল কর্মচারী। ছাত্র জীবনেই পেটিয়টের মধ্যে চুরি করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তখন সে সহপাঠীদের ছোটখাটো জিনিস সুযোগ পেলেই হস্তগত করতো। তার অপরাধ জীবনের শুরু হয় ডাকবাক্স থেকে মূল্যবান কাগজপত্র চুরি করার মধ্য দিয়ে। ১৯১৭ সালে বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং নেবার সময় সে নার্সিং বিভাগ বেছে নেয়। সেখান থেকেও সে বহু দামী ঔষধপত্র চুরি করে তা কালোবাজারে

Mamun Academy

বিক্রি করে বেশ কিছু টাকা-পয়সা রোজগার করে। তারপর সে কৌশলে সামরিক জীবন থেকে অব্যাহতি নিয়ে পেনশনও লাভ করে। ১৯২১ সালে সে ডাক্তারীতে ভর্তি হয়। তার অপূর্ব মেধার পরিচয় পাওয়া যায় এখানেই, যখন দেখা যায়, সে একের পর এক কঠিন ডাক্তারী পরীক্ষাসমূহ সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অথচ তার মা, যার সঙ্গে সে ছাত্র জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছিল, তিনি বলেন, ধরতে গেলে তাঁর পুত্রকে বাসায় কখনও তিনি বই পড়তে দেখেননি।

ডাক্তারী পাশ করার পর প্রথম জীবনে ডাঃ পেটিয়ট দ্রুত উন্নতির শিখরে উঠতে শুরু করে। ধরে নেয়া যায়, যদি তার মধ্যে অতিরিক্ত অর্থলিপ্সা ও চৌর্যবৃত্তির প্রবণতা না থাকতো, তবে তার অপূর্ব মেধা ও বিরল গুণাবলীর কল্যাণে সে-ও ফরাসী দেশের প্রাতঃস্মরণীয় আর দশজনের মধ্যে একজন হতে পারতো।

প্রথমে সে ভেলিনিউরে ডাক্তার হিসেবে প্র্যাকটিস শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যেই বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে সে। এমন কি ১৯২৮ সালে সে স্থানীয় 'মেয়র ও নির্বাচিত হয়।

পেটিয়ট তখনও অবিবাহিত। এই সময় সে একজন অনন্যাসুন্দরী তরুণীকে ঘরের কাজের জন্য নিয়োগ করে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ঐ তরুণী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। কয়েক মাসের মধ্যেই এই ঘটনা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে। এর পরপরই হঠাৎ একদিন ঐ তরুণী আশ্চর্যজনক ভাবে উধাও হয়ে যায়। কোনদিন কেউ তাকে আর কোথাও দেখতে পায়নি।

এরপর অবশ্য ডাঃ পেটিয়ট মিস্ জর্জেটি নামের এক ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করে। তার গর্ভে একটি পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করে।

Mamun Academy

মেয়র থাকাকালীন পেটিয়ট শহরবাসী ও তার কর্মচারীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু তখনও সে তার চুরি করার পুরানো স্বভাব ছাড়তে পারেনি, সে-জিনিস যত সামান্যই হোক না কেন! মেয়র থাকাকালীন কয়েকটি ইলেকট্রিক মিটার চুরির অপরাধে পুলিশ একবার তাকে অপদস্থ করে। আর একবার মিউনিসিপ্যালিটির স্টোর থেকে কয়েকটি জিনিস চুরির দায়ে কয়েকদিনের জন্য তাকে জেল হাজতেও থাকতে হয়। প্রধানত এই হাতসাফাইয়ের দোষেই ১৯-৩০ সালের নির্বাচনে সে আর ঐ শহরের মেয়র নির্বাচিত হতে পারে-নি। ঐ বৎসরই ম্যাডাম ডেরোভী নামের এক ধনী রোগিণীর সর্বস্ব চুরি করে নেয় ডাঃ পেটিয়ট। যাতে ঐ চুরির খবর প্রকাশ না পায়, তাই গোপনে সে ঐ রোগিণীকে হত্যা করে তার লাশ গুম করে ফেলে। তার চিকিৎসাধীনে থাকাকালীন ডেরোভীর রহস্য-জনক অন্তর্ধানে আশেপাশের রোগীরা কানাঘুষা করতে থাকে এই বলে যে, ডাঃ পেটিয়টই ম্যাডাম ডেরোভীর হত্যাকারী। যে লোক-টি এ ব্যাপারে বেশি শোরগোল তুলেছিল সে-ও একদিন হঠাৎ করে মারা গেল। এই লোকটিও কিন্তু বাতের অসুখের জন্য ডাঃ পেটিয়-টের চিকিৎসাধীন ছিল। এর মৃত্যুর পর পেটিয়ট নিজেই অগ্রণী হয়ে ওর 'ডেথ সার্টিফিকেট' সই করে দিয়েছিল। এর কিছুদিন পর আর এক ভদ্রমহিলা তার মেয়েকে নিয়ে আসে ডাঃ পেটিয়টের কাছে চিকিৎসার জন্য। এই মেয়ে কয়েকটি বিশেষ ওষুধের প্রতি নেশা-গ্রস্ত ছিল। কিন্তু চিকিৎসাকালে হতভম্ব মা দেখতে পেলো, ডাক্তার তার মেয়েকে আরও নেশাগ্রস্ত করে তুলেছে: কারণ ডাক্তার নিজেও ছিল নেশাখোর। তাছাড়া আফিম চোরাকারবারীদের সঙ্গে তার গোপন যোগাযোগও ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এ-কারণে

Mamun Academy

একবার তাকে গ্রেপ্তারও করা হয়। অবশ্য বিচারে সেবার ডাক্তার মাত্র দশ পাউণ্ড জরিমানা দিয়েই রেহাই পায়। চিকিৎসাপ্রার্থী মেয়ের মা ডাক্তারের মানসিকতা দেখে বুঝতে পারে যে এ ডাক্তারের হাতে পড়ে তার মেয়ের ঐ রোগ নিরাময় দূরে থাক, বরং দিন দিন তা আরও বেড়ে যাবে। এদিকে মেয়ে কিন্তু ডাক্তারের চিকিৎসায় খুশি। অগত্যা মা ডাক্তারের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে অনেকের কাছে নালিশ জানাতে লাগলো। এর মাত্র কয়েকদিন পর থেকেই সেই মাকে আর কখনো কোথাও দেখা গেল না। কোথায়, কিভাবে তাকে চিরদিনের মতো গুম করে ফেলা হলো তা কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলো না। তবে অনেকেই বুঝতে পারলো যে,এটা 'গভীর জলের মাছ' এই ডাক্তারেরই কাণ্ড হতে পারে। পুলিশ এভাবে দু'দুজন মহিলার রহস্যজনক অন্তর্ধান সম্পর্কে তদন্ত শুরু করলো। কিন্তু একদিন দেখা গেল কোনো এক অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে তদন্তের পুরো ফাইলটিই উধাও। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোল তখন বেজে উঠেছে। আর ফ্রান্স তো প্রথম থেকেই সেই যুদ্ধে মারাত্মক ভাবে জড়িয়ে পড়ে। তাই তখনকার মতো এই ব্যাপার নিয়ে আর কেউ বিশেষ মাথা ঘামায়নি।

ডাঃ পেটিয়ট দেখলো এই তো সুযোগ! যুদ্ধের ভাঙাগড়ার মধ্যে সে রাতারাতি ধনী হবার এক অভিনব পরিকল্পনা করে ফেললো। ১৯৪১ সালে ভয়াবহ মহাযুদ্ধের শুরুতেই ডাঃ পেটিয়ট ফ্রান্সের রুহ্ লেজুর অঞ্চলের এক নির্জন এলাকায় একটি বিশাল বাড়ি কিনে ফেললো। বেশ কিছু টাকা খরচ করে পুরো বাড়িটি তার পরিকল্পনা মতো অদল বদল করে ফেললো। বাড়ির চারদিক উঁচু দেয়াল তুলে বাড়ির আঙিনাটি সম্পূর্ণ ঘিরে ফেললো,যাতে পার্শ্ববর্তী কোনো

Mamun Academy

বাড়ি বা গাছপালা থেকে কেউ এর ভেতরটা না দেখতে পায়। তারপর এবাড়ির মধ্যে সযত্নে সে জানালাবিহীন তিনকোণা বিশিষ্ট একটি গোপন কুঠুরি তৈরি করলো। ঘরটিতে একটি মাত্র ছোট দরজা ছিল। আর ছিল পেরিস্কোপ বসানো একটি গোপন ছিদ্র,যার সাহায্যে বাইরে বসেই ডাক্তার ওর ভেতরে কি ঘটছে তার সবটুকু পরিষ্কার দেখতে পেতো, অথচ ঐ কুঠুরি থেকে কেউ কোনভাবেই তাকে দেখতে পেতো না। এর সম্পূর্ণ কাজ ডাক্তার ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যেই শেষ করে ফেললো। সে নিজে কিন্তু সবসময় এ-বাড়িতে থাকতো না। এই বাড়ির দোতলার কোনো অংশও কেউ ব্যবহার করতো না। এভাবে মানুষ খুন করার এক অভিনব ফাঁদ তৈরি করলো ডাক্তার ঐ বাড়িতে। পরিবার সহ নিজের বসবাসের জন্য সে ৬৬ নং 'রুঁহ্ কুমারটিনে' একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল, সেখানে রোগী দেখার জন্য একটি ছোট ঘরও ছিল।

হিটলারের নাৎসী বাহিনীর ব্লিৎসক্রিগ আক্রমণে সমগ্র ফ্রান্স তখন জার্মানদের পদানত। জেনারেল দ্য গল তাঁর অনুগত সৈন্য ও দলবলসহ ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় নিলেন। সেখানে তিনি দেশপ্রেমিকদের নিয়ে নির্বাসনে এক স্বাধীন ফরাসী সরকার গড়ে তুললেন। সেই সময় নাৎসী জার্মানদের অত্যাচারে ভীত সন্ত্রস্ত ফরাসী, ইহুদী ও ইউরোপের অন্যান্য জার্মান পদানত অঞ্চলের বহু লোক তাদের যথাসর্বস্ব নিয়ে মুক্তাঞ্চল ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েপড়েছিল। কিন্তু কড়া জার্মান বেষ্টনী অতিক্রম করে, ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে, গোপনে দেশ ত্যাগ করা সহজসাধ্য ছিল না।

ঠিক এই সময় চতুর ডাঃ পেটিয়ট গোপনে প্রচার শুরু করেছিল,

সে জার্মানদের বিরুদ্ধে গঠিত গোপন মুক্তি আন্দোলন সংস্থার একজন সদস্য ও জেনারেল দ্য গলের নির্বাচিত স্বাধীন ফরাসী সরকারের অনুগামী। এখানে তাদের দলের উদ্দেশ্য ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য মুক্তাঞ্চলে যেতে আগ্রহী ব্যক্তিদের নিরাপদে নাৎসী পদানত এলাকা থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করা। আগ্রহী ব্যক্তিরা গোপনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে সে গোপন সংস্থা মারফত তাদের নিরাপদে ইংলিশ চ্যানেল পার করে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করে থাকে। আগ্রহী লোকদের উপদেশ দেয়া হতো যে রাতের অন্ধকারে তারা যেন তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, সোনাদানা ও টাকাপয়সা নিয়ে তার নতুন তৈরি রুহু লেজুরের বাড়িতে এসে হাজির হয়। গোপনে মুক্তাঞ্চলে পাড়ি দেবার খরচের সংগ্রহের জন্য পেটিয়ট চারজন লোকও নিয়োগ করলো। তারা বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ, পানশালা, স্টেশন ও বিশেষ ভাবে ইহুদী এলাকায় গিয়ে লোকদের বুঝিয়ে গোপনে নিয়ে আসতো ডাঃ পেটিয়টের কাছে। সেখানে প্রথমে তাদের একটি কক্ষে জড়ো করা হতো, এরপর ডাক্তার নিজ হাতে প্রত্যেককে একটি করে ইন্‌জেকশন দিত। বলা হতো, এটা ম্যালেরিয়া নিরোধক ইন্‌জেকশন। তখন নাকি ইংল্যাণ্ডে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। তাই এই ইন্‌জেকশন এখান থেকে আগেই নিয়ে নিলে, ইংল্যাণ্ডে পৌছে তাদের আর কোনো অসুবিধা হবে না। এরপর তাদের নিয়ে যাওয়া হতো জানালাবিহীন, বিশেষ ভাবে তৈরি ত্রিভুজাকৃতি সেই ঘরটিতে—যাকে বলা হতো 'মৃত্যুগুহা'। সেখানে নিয়ে ডাক্তার তাদের নির্দেশ দিত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে। আর একটু পরেই মুক্তিফৌজের লোকেরা এসে তাদের নিয়ে যাবে রাতের অন্ধকারে ইংলিশ চ্যানেল

Mamun Academy

পার হবার জন্য গোপন স্থানে অপেক্ষমাণ জাহাজে তুলে দিতে। একথা বলে ওদের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে মৃত্যুগুহার কপাট বন্ধ করে দেয়া হতো। তারপর বাইরে থেকে ডাক্তার একটি পাইপের চাবি আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে দিলে ক্রমে ক্রমে সেই ঘর ভরে যেত মরণ-হুল্লী থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাসে। এদিকে ডাক্তার পার্শ্ববর্তী গোপন কক্ষে বসে পেরিস্কোপের ঢাকনা খুলে তার ছিদ্রে চোখ লাগিয়ে মহা উল্লাসে দেখতো, কিভাবে ঐ মানব সন্তানেরা বিষাক্ত গ্যাসের ক্রিয়ায় অসীম যন্ত্রণা ভোগের পর ঢলে পড়ছে একে একে মৃত্যুর হিম-শীতল কোলে। ঐ পেরিস্কোপ দিয়ে ডাক্তার আরও উপভোগ করতো, গ্যাসের বিষক্রিয়া শুরু হলে বন্ধ ঘরের মধ্যে কিভাবে পাগলের মতো ছোটাছুটি করে সবাই। বন্ধ দরজায় এসে করাঘাত করে তারা ডাকাডাকি করে ডাক্তারকে, ঐ মৃত্যুপুরী থেকে বাইরের আলো বাতাসে বেরিয়ে আসবার বিফল চেষ্টায়। কেউ বা দৌড়ে এসে ঘরের অমসৃণ দেয়ালে মাথা ঠোকে—যদি কোথাও কোনো ফাঁক পাওয়া যায়। আর পৈশাচিক উল্লাসে ভয়াবহ ঐসব দৃশ্য দেখে নরপিশাচ পেটিয়ট।

এভাবেই পেটিয়ট শিকার ধরে ধরে নিঃশব্দে তাদের হত্যা করতো। তারপর ওদের সঙ্গে আনা সারাজীবনের পুঁজি—সোনাদানা, হীরামুক্তা, টাকাপয়সা ও অন্যান্য সব দামী জিনিস আত্মসাৎ করতো। মানুষ হত্যা করার এই অভিনব ব্যবস্থা সে বেশ কয়েক বৎসর ধরে নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পেরেছিল। কেউ তখনো এ ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেনি—তৎকালীন ভয়াবহ যুদ্ধের কারণে। মৃতের আত্মীয়স্বজনেরা ভাবতো ডাঃ পেটিয়টের সহায়তায় তারা গোপনে সাগর পাড়ি দিয়ে নিরাপদে ইংল্যাণ্ড পৌঁছে গেছে। অথচ

Mamun Academy

ওরা যে ডাক্তারের খপ্পরে পড়ে পরপারে মহাযাত্রা করেছে তা কেউ তখনও জানতে পারেনি। এমন কি ডাঃ পেটিয়টের খদ্দের সংগ্রহ-কারীরাও জানতে পারেনি ডাক্তারের প্রকৃত অভিসন্ধি বা যাত্রীদের পরিণতির কথা। তারা কিন্তু দেশসেবার জন্য সরল বিশ্বাসেই এ কাজে এগিয়ে এসে ডাক্তারকে সাহায্য করতে চেয়েছিল।

ঠিক কতজন যে ঐ মৃত্যুগুহার শিকার হয়েছিল তার সঠিক হিসাব পাওয়া দুষ্কর। তবে এটা ঠিক যে, এখানে প্রথম শিকারটি ছিল একজন পোল্যাণ্ডবাসী—নাম গুজাবিনভ। সে বাস করতো পেটিয়টের 'রুয় কুমারটিনের' ফ্ল্যাটের কাছাকাছি। সেখানে তার একটি ভালো 'ফার' চামড়ার ব্যবসা ছিল। নাৎসী জার্মানদের হাত থেকে পরিত্রাণের আশায় সে তার চালু ব্যবসা বিক্রি করে দিয়ে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে ব্যাঙ্ক থেকে সারাজীবনের সঞ্চয় বিশ লাখ ফ্রাঙ্ক তুলে নিয়ে পেটিয়টের রহস্যঘেরা বাড়িতে গোপনে সন্ধ্যার পর এসে হাজির হয়েছিল। বলা বাহুল্য, তারপর থেকে তাকে আর কেউ দেখেনি, তার আত্মীয়স্বজনকে পেটিয়ট হাসিমুখে জানায় যে গুজাবিনভকে সে নিরাপদে ইংল্যাণ্ড পাঠিয়ে দিয়েছে।

পেটিয়টের আর একজন শিকার হলো তারই এক ভূতপূর্ব সহকর্মী ডাঃ পল ব্রাউন বার্জার। তিনিও ইংলাণ্ড যাবার আশায় তার সর্বস্ব নিয়ে একরাতে পেটিয়টের মৃত্যু গুহায় এসে হাজির হন, আর সেই থেকে উধাও হয়ে যান।

পরবর্তী কালে কোর্টে পেটিয়টের বিচারের সময় সবচেয়ে করুণ যে কাহিনী প্রকাশ পায় তা হলো, কেনিলারদের গোটা পরিবারের উধাও হওয়ার কাহিনী। স্ত্রী, কন্যা ও ফুলের মতো দেখতে নিষ্পাপ দুটি বাচ্চা নিয়ে একদিন সন্ধ্যায় কেনিলার এসে হাজির হলো

পেটিয়টের ভিলায়। সঙ্গে এনেছিল তাদের সারা জীবনের সঞ্চয়—নগদ পনের হাজার পাউণ্ড। উদ্দেশ্য, ইংল্যাণ্ড হয়ে সুদূর আমেরিকায় চলে যাবে গোটা পরিবার। আর সেখানে ঐ সঞ্চয় দিয়ে তারা নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে জীবনে। কিন্তু পেটিয়টের ভিলায় ঢুকবার পর থেকে কেউ আর দেখেনি তাদের। বিচারের সময় কোর্টে আলামত হিসেবে আনা বাচ্চাদের কঙ্কাল দেখে কেনিলারদের আত্মীয় স্বজনের কান্নায় পাষাণ হৃদয়ও গলে যেতো। পেটিয়ট তখনও ছিল অবিচলিত।

পেটিয়ট তার ঐ খুনী ব্যবসা নির্বিবাদে চালিয়ে যায় সমগ্র ১৯৪২ সাল ধরে। ১৯৪৩ সালের মে মাস পর্যন্তও কেউ টের পায়নি তার অভিসন্ধি। মে মাসে অবশ্য নাৎসী জার্মানীর-গেস্টাপো সদস্যদের নজরে পড়ে গেল সে। তারা খবর পেল যে ডাক্তার পেটিয়ট বহু লোককে গোপনে ইংল্যাণ্ডে পার করে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হবার জন্য গেস্টাপোরা তাদের অনুগত একজন ইহুদীকে ছদ্মবেশে পাঠিয়ে দিল পেটিয়টের কাছে, সে পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী গোপনে দেখা করলো পেটিয়টের সঙ্গে, তাকে ইংল্যাণ্ডে পার করে দেবার জন্য। এরপর থেকে ঐ ইহুদীর আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। এদিকে গেস্টাপোরা ভাবলো যে ঐ অনুগত ইহুদী সুযোগ পেয়ে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পেটিয়টের সাহায্যে সত্যিই ইংল্যাণ্ডে পাড়ি জমিয়েছে। এর পরেই জার্মানরা ডাক্তারকে বন্দী করলো গোপনে ইংল্যাণ্ডে লোক পাচারের অভিযোগে। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ সাত মাস পেটিয়ট জার্মানদের কাছে বন্দী রইলো। কিন্তু চতুর পেটিয়ট তার বিরুদ্ধে সে-সময় তদন্তকালে জার্মান প্রভুদের কাছে তার সমস্ত

Mamun Academy

ক্রিয়াকর্ম গোপনে প্রকাশ ক'রে তাদের বোঝাতে সক্ষম হয় যে, যদিও সে বাইরে ফরাসী গোপন প্রতিরোধ সংস্থার সাহায্যকারী হিসেবে নিজেকে জাহির করেছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জার্মান-দেরই একজন দোসর এবং গোপনে সে জার্মানদেরই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করে চলেছে। কারণ ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে যে-সব লোকেরা আসে, ডাক্তার শুধু তাদেরই গোপনে হত্যা করে থাকে। না হলে ওরাই তো বিলেতে গিয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, নতুবা তাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া টাকাপয়সা দিয়ে জার্মানীর শত্রুদের সাহায্য করবে। জার্মান গেস্টাপোরা তার এই যুক্তি মেনে নিলো। ওরা পেটিয়টের গ্যাস চেম্বার ঘুরে দেখলো যে, ওখানে ডাক্তার প্রকৃত-পক্ষে জার্মান শত্রুদের নিধন করে জার্মানদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রচুর সাহায্য করে চলেছে। তাই শেষ পর্যন্ত পেটিয়ট জার্মান কারাগার থেকে মুক্তি পেল।

এরপর থেকে পেটিয়ট আবার নতুন উদ্যমে তার হত্যালীলা চালাতে লাগলো আর সেই সঙ্গে অগাধ সম্পত্তিও অর্জন করে চললো।

১৯৪৪ সালের ১১ই মার্চ ডাঃ পেটিয়টের এক বিপত্তি ঘটলো। ঐদিন তার গ্যাস চেম্বারের কলকব্জা একটু বিগড়ে যায়। ফলে এর নিকটবর্তী এক বাসিন্দা জ্যাকুইস মার্কাইস দেখতে পেল, পেটিয়টের রহস্যঘেরা ভিলার চিমনি দিয়ে দুর্গন্ধময় কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে, তা থেকে চর্বিপোড়া গন্ধও পাওয়া যাচ্ছিল। জ্যাকুইস তখনই এ ব্যাপারটি পুলিশকে জানিয়ে দিল। খবর পেয়ে থানা থেকে দুজন পুলিশ এলো এ সম্পর্কে তদন্ত করতে।

Mamun Academy

পুলিশ পেটিয়টের রুহ লেজুরের বাড়ির বন্ধ দরজায় একটি কার্ড ঝোলানো দেখতে পেল—তাতে লেখা আছে : 'এ বাড়ি সম্বন্ধে কোনো খোঁজ নিতে হলে ৬৬ নং রুহ কুমারটিনে ডাঃ পেটিয়টের নিকট খোঁজ করুন।' পুলিশ অগত্যা সেই ঠিকানায় ডাঃ পেটিয়টকে ফোন করে ঐ দুর্গন্ধময় ধোঁয়ার কারণ জানতে চাইলো। উত্তরে পেটিয়ট বিনীতভাবে দুঃখ প্রকাশ করে বললো, ওটা অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে চিমনির ধোঁয়া আরও বেড়ে গেল, এক পর্যায়ে চিমনিতে আগুন ধরে গেল। পুলিশ সার্জেন্ট তখন আর দেরি না করে ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দিল। ফায়ার ব্রিগেডের লোক দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে বাড়ির তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকলো। ধোঁয়ার উৎস খুঁজতে খুঁজতে তারা সেই বিচিত্র ত্রিভুজাকৃতি মৃত্যু গুহায় এসে হাজির হলো। সেখানেই তারা আবিষ্কার করলো ডাক্তারের গোপন মারাত্মক গ্যাস চুল্লী। হতভম্ব ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা ঐ ঘরের এক নিভৃতস্থানে আরও পেল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু মৃত ব্যক্তির কঙ্কাল ও হাড়গোড়। গুণে দেখা গেল ২৭টি মানুষের কঙ্কাল আছে ওখানে। এদের অধিকাংশেরই শরীর বিচ্ছিন্ন ও আধপোড়া অবস্থায় ছিল। অবাক বিস্ময়ে পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা যখন ঐসব দেখছিল, তখনই সেখানে এসে হাজির হলো ডাঃ পেটিয়ট নিজে। নির্বিকার চিত্তে সে পুলিশকে নিজের পরিচয় দিয়ে জানালো যে সে-ই এই বাড়ির মালিক। উত্তরে পুলিশ সার্জেন্ট ঐসব নরকঙ্কালের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, এখানে যা দেখতে পেলাম তাতে আপনাকে গ্রেফতার করা ছাড়া আমাদের আর কোনো গত্যন্তর নেই।'

চতুর পেটিয়ট একটুও না ঘাবড়ে ফরাসী পুলিশ সার্জেন্টকে

Mamun Academy

গোপনে একপাশে ডেকে নিয়ে বোঝালো যে এখানে সে যা দেখছে সেগুলো নাৎসী জার্মানীর সমর্থক ও দোসরদের দেশদ্রোহিতার চরম শাস্তির স্বাক্ষর।

সে-সময় কিন্তু যুদ্ধের মোড় ঘুরে গিয়েছে। মিত্রশক্তির সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কায় ফ্রান্সে জার্মানদের অবস্থা টলটলায়মান। জেনারেল দ্য গলের সমর্থক ছিল তখন প্রায় সব ফরাসীরা।

পুলিশ সার্জেন্ট অতঃপর পরদিন আরও তদন্ত চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তখনকার মতো পেটিয়টকে ছেড়ে দিল।

সামনে বিপদ বুঝে পেটিয়ট দ্রুত চলে এলো তার ফ্ল্যাটে। তাড়াতাড়ি কয়েকটি স্যুটকেসে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভর্তি করে স্ত্রী ও তার ১৭ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে নিয়ে সে-রাতেই গোপনে ঐ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। এখানে বলে রাখা ভালো যে, ফরাসী দেশের আইন অনুসারে সেখানকার পুলিশ রাতের বেলা কোনো পরিবারের বাসস্থানে জোর করে ঢুকতে পারবে না। এই সুযোগেই পেটিয়ট ওখান থেকে পালাবার জন্য দীর্ঘ বারো ঘণ্টা সময় পেয়ে যায়।

পরদিন সকালে পুলিশ পেটিয়টের খোঁজে তার ফ্ল্যাটে এসে দেখতে পেল—খাঁচা শূন্য! পুলিশ তার সন্ধান করতে করতে শেষ পর্যন্ত অক্রারীতে গিয়ে পেটিয়টের ভাই ও স্ত্রীপুত্রের খোঁজ পেল। কিন্তু পেটিয়টকে ধরা গেল না। জানা গেল, সে তার ভাইয়ের রেডিওর দোকানে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে শেষরাতে কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে চলে গেছে। পুলিশ তদন্ত করে এ-ও জানতে পারলো যে, প্রকৃতপক্ষে পেটিয়টের স্ত্রী-পুত্র তার ঐ ঘৃণ্য গ্যাস চেম্বার সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল।

Mamun Academy

এরপরই শুরু হলো ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আর এক উত্থান পতন। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে এলো স্মরণীয় ডি-ডে (D-Day)—যেদিন সম্মিলিত মিত্র বাহিনী ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ফরাসী উপকূলে আক্রমণ চালালো। ২৪শে আগস্ট ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস শহরের পতন হলো। প্রায় চার বছর পর মিত্র শক্তিবর্গ আবার প্যারিস শহর শত্রুমুক্ত করলো। জেনারেল দ্য গলও আবার ফিরে এলেন নিজ দেশে। কিন্তু তাদের কেউ এলো না, যারা গিয়েছিল পেটিয়টের কাছে ইংলিশ চ্যানেল পার হবার আশায়। এদিকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে পেটিয়টের জঘন্য হত্যালীলার রোমহর্ষক খবর বের হতে শুরু করলো। তার গ্যাস চেম্বারে নিহত লোকদের আত্মীয়স্বজনেরাও এবার জানতে পারলো প্রকৃত ঘটনা।

পেটিয়টের কিন্তু আর কোনো খোঁজ নেই। ওর সম্পর্কে কাগজে এসময় নানারকম সংবাদ বেরোতে শুরু করলো, প্রতিদিন খবরের কাগজের অনেকখানি অংশ জুড়ে রইলো তার সম্পর্কে নানা গুজব। আর সেসব সংবাদ গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল পাঠক মহলে। একবার এক কাগজে সংবাদ বেরুলো যে নদীতে তার লাশ ভাসতে দেখা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে শত শত লোক ভিড় করতে লাগলো ঐ নদীর দুপাশে। কিন্তু কোথায় তার লাশ? কেউ খুঁজে পেল না পেটিয়টকে, ওটা গুজব মাত্র।

আবার এক কাগজে রিপোর্ট বেরুলো যে পেটিয়ট পলায়মান জার্মানদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে তাদের এক বন্দী শিবিরে ডাক্তারীতে নিযুক্ত আছে। কিন্তু পেটিয়টের স্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানালো, তার বিশ্বাস, তার স্বামী ফরাসী মুক্তি যোদ্ধাদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ সংবাদপত্রই এই উক্তির সত্যতা

অস্বীকার করে লিখলো যে ঐ নরপিশাচ নিশ্চয়ই জার্মান গেস্টাপোদের দোসর হয়ে কাজ করছে।

১৯৪৪ সালের অক্টোবরে আত্মগোপনকারী পেটিয়ট এক মারাত্মক ভুল করে বসলো, যার ফলে মহাযুদ্ধের বিশৃঙ্খলার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হলো। ঐ মাসে সে ফরাসী মুক্তি যোদ্ধাদের মুখপত্র রেজিস্ট্যান্স (Resistance) নামের পত্রিকায় বেনামীতে একটি চিঠি লিখে জানায় যে প্রকৃতপক্ষে জার্মান গেস্টাপোরাই পেটিয়টের মতো দেশপ্রেমিকদের তাদের শিকারে পরিণত করেছে—১৯৪৩ সালে দীর্ঘ সাত মাস যখন সে জার্মানদের হাতে বন্দী ছিল, তখনই জার্মানরা তার বাড়িটি একটি বধ্যভূমি হিসেবে ব্যবহার করে, সেখানে নিহত ব্যক্তিদের লাশ জমা করে। আর এখন জার্মানীর সেই গোপন সংস্থাই তার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে ওর বিরুদ্ধে এক মিথ্যা প্রচার অভিযান চালাচ্ছে। ওদের এই প্রচারণার একমাত্র উদ্দেশ্য, (তৎকালীন) যুদ্ধে রাশিয়ার অগ্রগতির সম্ভাব্য বিপদ থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেবার চেষ্টা। ঐ পত্র লেখক আরও জানায় যে পেটিয়ট এখনও ফরাসী মুক্তি সংস্থার অফিসার হিসেবে জার্মানদের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে।

ফরাসী পুলিশ কিন্তু হত্যাকাণ্ডগুলি তদন্তের পর পেটিয়টের বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ পেয়ে, সে-ই যে এসবের জন্য দায়ী সে-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিল। পুলিশ পত্রিকা অফিসে গিয়ে ঐ চিঠির মূলকপি সংগ্রহ করে বুঝতে পারে যে ওটা ডাঃ পেটিয়টেরই নিজ হাতে লেখা। দেশ মুক্ত হবার পর প্যারিস মুক্তি সংস্থায় যত অফিসার ভর্তি করা হয়েছে তাদের সবার হস্তাক্ষর পুলিশ সংগ্রহ করলো। পরীক্ষা করে দেখা গেল মুক্তি সংস্থার ক্যাপ্টেন হেনরী ভেলারী নামের এক

Mamun Academy

ব্যক্তির হস্তাক্ষরের সঙ্গে চিঠির লেখা হুবহু মেলে। ভেলারী তখন ফ্রান্সের রিউলী নামক স্থানে কার্যরত ছিল। মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে সে স্বাধীন ফরাসী বাহিনীতে ভর্তি হয়েছিল। এই সূত্র ধরে ১৯৪৪ সালের ২রা নভেম্বর পুলিশ ফেরারী আসামী পেটিয়ট ওরফে ক্যাপ্টেন ভেলারীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হলো। এতবড় হত্যা-কারীর গ্রেফতারের সংবাদ দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে ছাপা হলো। দলে দলে লোক ভিড় করলো তাকে একনজর দেখার জন্য।

জানা গেল, পালিয়ে যাবার পর পেটিয়ট দীর্ঘ সাত মাস সেন্ট ডেনিস নামক স্থানে একটি ফ্ল্যাটে আত্মগোপন করে ছিল। ঐ সময় সে মুখে লম্বা দাড়ি রাখে। তার বুকেও ছিল বড় বড় কালো লোম। ঐ ফ্ল্যাটে থাকাকালীন সে প্রতিদিন সকালে রোদ পোহাবার জন্য খালি গায়ে তার বিশাল বপু নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতো। তার বিশাল নগ্ন শরীর, লম্বা দাড়ি, ও রোমশ শরীর নিয়ে ওভাবে দাঁড়াতে দেখে স্থানীয় লোকেরা তার নাম দিয়েছিল টারজান। সেখানে তার আশ্রয়দাতা ছিল রিডোউটি নামের একজন রং মিস্ত্রী। তাকে পেটিয়ট বলেছিল যে বোমার আঘাতে তার বাড়ি ধ্বংস হয়ে তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এখন সে নিঃসঙ্গ। এরপর ২৭শে সেপ্টেম্বর সে ফরাসী মুক্তি বাহিনীতে ডাক্তার হিসেবে যোগ দেয় হেনরী ভেলারী ছদ্মনাম নিয়ে। তার প্রধান কাজ ছিল চিকিৎসাধীন যুদ্ধ-বন্দীদের কাছ থেকে চিকিৎসার ফাঁকে ফাঁকে যুদ্ধের খবরাখবর সং-গ্রহ করা। এ কাজে কিন্তু সে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল।

পুলিশী তদন্তের সময় পেটিয়ট নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে। তার বক্তব্য অনুসারে পুলিশ যে ২৭টি নরকঙ্কাল তার ঘরে পেয়ে-

ছিল সেগুলো সবই জার্মান সৈন্যদের মৃতদেহের ভগ্নাবশেষ। প্রকৃত-পক্ষে সে মোট ৬৩ জন নাৎসীকে ঐভাবে হত্যা করেছে। বরাবরই সে ফরাসী মুক্তি যোদ্ধাদের পক্ষে দেশে থেকেই কাজ করে যাচ্ছিল, এবং সে বহু দেশপ্রেমিক ফরাসীকে সমুদ্র পার করে ইংল্যাণ্ডে যেতে সাহায্য করেছে। উদাহরণ হিসেবে বিখ্যাত কয়েকজন ফরাসী দেশ-প্রেমিকের নামও সে উল্লেখ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের কেউই তখন জীবিত ছিল না।

পুলিশ দীর্ঘ সতের মাস যাবত এই মামলার তদন্ত পরিচালনা করে তার বিরুদ্ধে জ্ঞাত ২৭টি নরহত্যার অভিযোগ আনে। ১৯৪৬ সালের ১৮ই মার্চ ফরাসীর 'সেন আসিজ (Seine Assize) কোর্টে এই চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার শুরু হয়। রেনি ফ্লোরিয়ট নামের একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন উকিল এই বিচারে আসামী পেটিয়টের পক্ষ সমর্থন করেন। দীর্ঘ তিন সপ্তাহ ধরে চলে এই বিচার। সে-সময় পেটিয়টের মরণ ফাঁদের শিকার হতভাগ্যদের আত্মীয়স্বজনেরা কোর্টরুমে ভিড় করে থাকতো। তাদের সাক্ষ্যে যে সব করুণ কাহি-নী প্রকাশিত হয়, তা শুনে কোর্টে উপস্থিত শত শত লোকের অনে-কেই অশ্রু সংবরণ করতে পারেনি।

এসব হত্যাকাণ্ডের পেছনে অর্থ লালসাই প্রধান কারণ ছিল। এ-ছাড়া বন্দীদের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখেও পেটিয়ট অনুভব করতো এক চরম শিহরণ, যা তাকে আকর্ষণ করতো পেরিস্কোপ দিয়ে এইসব হত্যাকাণ্ড দেখতে। বিচারে প্রকাশ পায়, পেটিয়ট নিহতদের কাছ থেকে কমপক্ষে একলক্ষ পাউণ্ড আত্মসাৎ করে। সমগ্র বিচারে মাত্র একজন মুক্তি সংস্থার নেতা পেটিয়টের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে, ঐ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের অধিকাংশই পেটিয়টের অগোচরে হয়েছে,

Mamun Academy

সুতরাং তাকে দায়ী করা যায় না।

বিচারের পঞ্চম দিনে ঘটনাস্থলে সরজমিনে দেখার জন্য জুরী সহ বিচারকগণ রুহ লেজুরে (Rue Lesuere) গিয়ে ঐ মরণ কক্ষ স্বচক্ষে দেখে আসেন। সমগ্র ভিলা, তার ত্রিভুজাকৃতি ঘরের অভিনব গঠন প্রকৃতি, দরজা, বাইরে থেকে ভিতরের মৃত্যুযন্ত্রণার দৃশ্য দেখার ছোট্ট ছিদ্রপথ ও মরণচুল্লী—সবই বিচারকদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

বিচার শেষে ৪ঠা এপ্রিল রাত ৯-৩০ মিনিটে সাতজন জুরীসহ মোট তিনজন জজ আলোচনার জন্য রুদ্ধ কক্ষে মিলিত হন। দীর্ঘ আলোচনার পর একমত হয়ে তাঁরা রাত দুপুরে কোর্টরুমে ফিরে এলেন। বায়ে ২৭টি খুনের অভিযোগের মধ্যে অন্তত ২৪ ব্যক্তিকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যার অপরাধে পেটিয়টকে তাঁরা একবাক্যে দোষী সাব্যস্ত ক'রে তাকে চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

কোর্টের রায় ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত মধ্যরাতেও পরিপূর্ণ কোর্টরুমে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। বিচারকদের সর্বসম্মত রায় শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কোর্টরুমে হৈ-চৈ পড়ে যায়। দাবানলের মতো তা ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পেটিয়ট মৃত্যুদণ্ডের রায় শুনে তার গার্ডদের ধাক্কা মারে ও বিরাট বপু নিয়ে তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ও চিৎকার করতে শুরু করে। আরও পুলিশ এসে তাকে নিবৃত্ত করে।

পেটিয়ট ঐ রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল দায়ের করে। কিন্তু সেখানে তার আপীল অগ্রাহ্য হয়।

অতঃপর ১৯৪৬ সালের ২৬শে মে প্রত্যুষে গিলোটিনে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

Mamun Academy

ক্ষতিপূরণ

চব্বিশ পরগণা জেলার তৎকালীন ইংরেজ আই. সি.এস. জেলা জজ মিঃ এম. এইচ, বি. লেথব্রিজ (Mr. M. H. B. Lethbridge) ১৯৪০ সালের ২৯শে আগস্ট এক চাঞ্চল্যকর মামলার রায় প্রদান করেন, যা নিয়ে কলকাতার অভিজাত মহলে সে-সময়ে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

বাদী ডাঃ নিরঞ্জন দাস মোহন মোকদ্দমাটি রুজু করেন স্ত্রী মিসেস এনা মোহন ও তার তিনজন প্রেমিকের বিরুদ্ধে। মামলার আর্জিতে বাদী অভিযোগ করেন যে তাঁর বিবাহিত স্ত্রী এনা মোহন পর পুরুষদের সঙ্গে ক্রমাগত ব্যভিচারে লিপ্ত রয়েছে। তাই তার সঙ্গে আর দাম্পত্য সম্পর্ক রাখা সম্ভব না হওয়ায় আদালতের কাছে প্রথমতঃ বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি করেন। সেই সঙ্গে বাদী ডাঃ নিরঞ্জন তাঁর স্ত্রীর তিনজন অবৈধ প্রেমিকের কাছেও বিভিন্ন অংকের ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। এই তিনজন ব্যক্তি হলেন : (১) এডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ পাল, (২)মিঃ এইচ. কে. লালভানী, (৩) এবং মিঃ জি.এম.মেনন। বাদীর অভিযোগে প্রকাশ পায় যে, উক্ত তিন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে তাঁর জানামতে কমপক্ষে ১৮ বার তাঁর স্ত্রী মিসেস এনা মোহনের সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হয়ে তাঁর দাম্পত্য জীবনে মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে, এবং বাদী ও তাঁর পাঁচ সন্তানের ঘোরতর মানসিক

Mamun Academy

অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বন্ধু মহল ও সমাজেও তাঁরা ভয়ানক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন। তাই বাদী তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়ান ডিভোর্স অ্যাক্টের ১০ ও ৩৪ ধারা মতে ব্যভিচারের অভিযোগে বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি করেন। সেই সঙ্গে ঐ একই আইনের অধীনে স্ত্রীর প্রেমিকদের প্রথম জনের বিরুদ্ধে পনের হাজার টাকা ও অন্য দুজনের বিরুদ্ধে পাঁচ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।

ডাঃ নিরঞ্জন দাস ছিলেন হিন্দু আর্য সমাজভুক্ত একজন নামকরা ব্যক্তি। ওদিকে তাঁর স্ত্রী এনা মোহনের ধনী পিতামাতা ছিল খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। বিয়ের আগে ডাঃ নিরঞ্জন ও এনা পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে ক্রমে ক্রমে গভীর প্রেমে পড়ে যান। ওঁরা বিয়ে করবেন বলে ঠিক করেন। কিন্তু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ায় সামাজিক বাধা বিপত্তি এসে দাঁড়ায়। এই বাধা দূর করার জন্য মিস এনা ১৯২৫ সালের ৫ই এপ্রিল হিন্দু আর্য ধর্মে দীক্ষিত হয়, এবং প্রেমে পাগল উভয়ে ঐ দিনই আর্য ধর্মের বিধান মতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অবশ্য এর কিছুদিন আগে ১৩ই মার্চ তাঁরা খ্রীষ্টান আইনে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের অধীনে আর একবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সে-সময় মিস এনা খ্রীষ্টান বিবাহ রেজিস্ট্রারের কাছে ঘোষণা করে যে সে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী, যদিও মনেপ্রাণে তখন সে একজন হিন্দু। তার স্বামীও প্রথমে ঘোষণা করেন যে তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তখন রেজিস্ট্রার খ্রীষ্টান আইনের অধীনে তাঁদের বিবাহ রেজিস্ট্রি করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর বাধা দূর করার জন্য ডাঃ নিরঞ্জন প্রকাশ করেন যে তিনি আসলে কোনো ধর্মাবলম্বীই নন, এবং এনাকে তিনি বিয়ে করতে আগ্রহী। অতঃপর স্পেশাল আইনে

Mamun Academy

তাঁদের বিয়ে রেজিস্ট্রি হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁরা হিন্দু আইনে আবার বিয়ে করেন।

বিয়ের পর ১৯৩৮ সালের ২৮শে জানুয়ারী পর্যন্ত দীর্ঘ ১৩ বৎসর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করেন। এসময়ের মধ্যে তাঁদের তিনটি পুত্র ও দুটি কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তবে বাদীর মতে তাঁরা কখনোই নিরবচ্ছিন্ন সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করতে পারেন-নি, প্রধানতঃ তাঁর স্ত্রীর স্বৈরিণী স্বভাব আর সেই সঙ্গে অন্যান্য বিবাদী পুরুষের অনাচারের কারণে। প্রকৃতপক্ষে ১৯২৯ সাল থেকেই ঐ কামুক মহিলা বিভিন্ন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল। ১৯৩৯ সালের ৯ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪০ সালের ৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত ১ নম্বর বিবাদী বি. এন. পাল যে এনা মোহনের সঙ্গে ক্রমাগত ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আজিতে বাদী নিরঞ্জন তাঁর স্ত্রীর পদস্খলনের মোট আঠারটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন।

অন্যদিকে স্ত্রী এনা মোহনও ঐ একই আদালতে তার স্বামীর বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান আইনের বিধান মতে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনা জানিয়ে আবেদন করে। স্ত্রী তার আবেদনে প্রকাশ করে যে, এখন সে পুনরায় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে তার হিন্দু স্বামীর কাছ থেকে আলাদা ভাবে বসবাস করছে, কারণ স্বামী তার ওপর অনবরত দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন করে তার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। সুতরাং তার পক্ষে স্বামীর সঙ্গে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

মাননীয় ইংরেজ জেলা জজ বিচারশেষে তাঁর রায়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে স্ত্রী এনা মোহন তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। স্বামী যে তার ওপরে কোনো

Mamun Academy

প্রকার নির্যাতন করেছে তার কোনো প্রমাণই মেলেনি। বরং দেখা যায় যে, স্ত্রী এনা মোহনই বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে তার প্রতি স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ করে বিবাহের পবিত্রতা নষ্ট করেছে। তাই বিচারক স্ত্রীর আনীত তালাকের আবেদন অগ্রাহ্য করেন।

সেই সঙ্গে মাননীয় জেলা জজ বাদী নিরঞ্জন দাসের মামলাও ডিসমিস করতে গিয়ে তাঁর রায়ে বলেন—'তাহলে ব্যাপারটি সংক্ষেপে দাঁড়াচ্ছে এই যে, নিরঞ্জন দাসের স্ত্রী হয়েও এনা মোহন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল বলে বেশকিছু বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু এইসব ঘটনা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বাদী যত সন্দেহজনক সাক্ষ্য উপস্থিত করার প্রয়াস পেয়েছে, যার অনেকগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেও প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বাদীর অভিযোগের অসারতার সবচেয়ে মারাত্মক দিকটা হলো এই যে, বাদী এসব ঘটনার পরপরই স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনয়ন করেননি। বরং বিবাদিনী (স্ত্রী) তাঁকে ছেড়ে যাবার দীর্ঘ দুই বৎসর পর বাদী সর্বপ্রথম কোর্টে তাঁর অভিযোগ আনয়ন করেছেন। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, বাদী পূর্বেই তাঁর স্ত্রীর অতীত অনাচারগুলি ক্ষমা করে দিয়েছেন। এতদিন পরে আবার প্রধানতঃ সেসব অতীত অভিযোগের ভিত্তিতে নালিশ করার অধিকার তিনি এখন হারিয়েছেন।'

বাদী নিরঞ্জন রায় জজ কোর্টের উপরোক্ত রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন স্বনামধন্য বিচারপতি জাস্টিস নাসিম আলী ও জাস্টিস রাও এই আপীলের শুনানী করেন। আপীলের রায়ে মাননীয় বিচার-

Mamun Academy

পতিদ্বয় জজ সাহেবের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। রায়ে তাঁরা জজ সাহেবের উপরোক্ত যুক্তি খণ্ডন করে তাঁদের রায়ে বলেন—'বাদী তাঁর স্ত্রীর কেলেঙ্কারীর কাহিনী জানবার পরপরই কোর্টে না আসার কৈফিয়ত দিয়ে বলেছেন যে, তিনি তখন তাঁর বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ ও পারিবারিক সম্ভ্রমের কথা চিন্তা করে, বাইরে যাতে এই কলঙ্ক প্রচারিত না হয় সেজন্যেই এতদিন এ ব্যাপারে চুপ করে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্তও যখন স্ত্রীকে সৎপথে আনা গেল না, বরং স্ত্রী যখন নিজেই বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা রুজু করলো, তখনই তাঁকে বাধ্য হয়ে এতদিন পরে সব সত্য প্রকাশ করতে হয়েছে।'

বাদীর এই যুক্তি গ্রহণ করে বিচারপতি বলেন—'ভারতীয় সমাজ ও আচার ব্যবহার কথা বিবেচনা করে আমরা এই যুক্তি গ্রহণ করছি। কারণ এ দেশে পারিবারিক মানসম্ভ্রম ও সামাজিক আচার ব্যবহার এমনিই যে নিতান্ত বাধ্য না হলে সহজে কেউ এসব কলঙ্ক বাইরে প্রকাশ হতে দিতে চায় না। তাই বিজ্ঞ জেলা জজের শুধু এই কারণে বাদীর কেস ডিসমিস করা উচিত হয়নি।'

বিচারপতি তাঁর রায়ে ঘটনা সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন—'স্বামী নিরঞ্জনের আনা সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তাঁর অভিযোগে বলা হয়েছে যে তাঁর স্ত্রী এনা মোহন প্রথমতঃ ১৯৩২ সালের ৫ই মে থেকে ২৪শে মে পর্যন্ত বিবাদী মেননের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে। দ্বিতীয়তঃ ১৯৩৮ সালের ২৯শে ও ৩০শে মার্চ এনা মোহন বিবাদী লালভানীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে। তৃতীয়তঃ এনা মোহন বিবাদী বি. এন. পালের সঙ্গে অবৈধ যৌনকর্মে লিপ্ত থাকে ১৯৩৮ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত, পরে ১৯৩৯ সালের ৯ই ডিসেম্বর হতে

১৯৪০ সালের ৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত।

বি, এন, পালের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ সম্পর্কিত সাক্ষ্য-প্রমাণে পাওয়া যায় যে ১৯৩৮ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মিসেস এনা মোহন কলকাতার ৩৪/১, ডি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের এক বাসায় বসবাস করতো। সে-সময় বি. এন. পাল প্রতিদিন বিকেলে তার কাছে ঐ বাসায় যাতায়াত করতো। এ সম্পর্কে পাল নিজেই বলেছে। 'এনা বালি-গঞ্জে থাকাকালীন আমি প্রত্যহ বিকালে কোর্টের কাজ শেষে তার বাসায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতাম ঠিকই, তবে তা কেবল আমি একজন উকিল ও এনা আমার একজন মক্কেল হিসেবেই মাত্র।' কিন্তু আবার পালেরই সাক্ষী পঞ্চানন আদিত্যের জবানবন্দীতে প্রকাশ পায় যে ঐ সময় পাল এনা মোহনের ব্যবহারের জন্য নিজেই একটি মোটর গাড়ি পছন্দ করে ও তার বাকি মূল্যের জন্য সে নিজেই জামিন হয়। এ ঘটনার ৬ মাস পরে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের ১৫ই মার্চ পালের কাছে এনা মোহনের লেখা একটি গোপন চিঠিও বাদীপক্ষ কোর্টে দাখিল করেন, যাতে পালের সঙ্গে এনার দৈহিক প্রেমের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই চিঠি প্রসঙ্গে মাননীয় বিচারপতি মন্তব্য করেন—'চিঠিটি নিঃসন্দেহে সাক্ষ্য আইনের ১৪ ধারা মতে পালের প্রতি পরস্ত্রী এনা মোহনের মনোভাব সম্পর্কে একটি ভালো ও গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে এখানে আমরা এরকম একজন অস্থির-মনা মহিলা সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করছি, যে ঘন ঘন প্রেম ভাল-বাসা পরিবর্তন করে থাকে। ১৯৩৮ সালের মার্চের শেষে এইমহিলা লালভানীর সঙ্গে প্রেমে মগ্ন ছিল। আবার ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে

Mamun Academy

সে বি. এন. পালের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। আবার ১৯৩৮ সালের পূর্বের ইতিহাসেও দেখা যায় যে,সে প্রেমের ব্যাপারে ছিল সদাপরিবর্তনশীল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে লেখা এনা মোহনের চিঠিতে তার যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা পূর্ববর্তী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসেও তার মানসিক অবস্থার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা মোটেই নিরাপদ হবে না। যদিও পরবর্তী চিঠি লেখার সময় হয়তো পাল এনা মোহনের সঙ্গে গভীর প্রেমে মগ্ন ছিল, কিন্তু তাই বলে পূর্ববর্তী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসেও যে সে এনা মোহনের সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত ছিল, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না।

তদুপরি বালিগঞ্জের এ বাসায় থাকাকালীন এনা মোহনের সঙ্গে থাকতো তার সন্তানেরা এবং দুখদা দাসী নামে একজন আয়া। এই আয়ার সাক্ষ্যে জানা যায় যে, রাতে একই ঘরে আয়া এনার এক ছেলে নিয়ে মেঝেতে নিদ্রা যেতো, আর এনা অন্য সন্তানদের নিয়ে খাটের ওপর থাকতো। এ অবস্থায় বিচারপতি মনে করেন যে, কোনো পুরুষের পক্ষে সে-ঘরে রাতে এসে এনার সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হওয়া অস্বাভাবিক। অতএব উপরোক্ত সময়ে এনা ও পালের মধ্যে ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বলে হাইকোর্ট মনে করে।

পালের বিরুদ্ধে এনার সঙ্গে ব্যভিচারের পরবর্তী অভিযোগের সময়কাল ছিল রাঁচিতে ১৯৩৯ সালের ৯ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪০ সালের ৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত। এই সময় পাল রাঁচি শহরে 'আর্য-নিবাস' নামের একটি বাড়িতে বাস করতো। আর ঠিক ঐ সময় এনা মোহনও রাঁচিতে এসে ১৬ নং পুরুলিয়া রোডে একটি বোর্ডিং-

হাউসে থাকতো। ঐ বোর্ডিং হাউসের পাচক বেয়ারার নাম ছিল বেনিডিকট ঘি (Benedict Ghee)। এই মামলায় কোর্টে এসে সে-ও সাক্ষ্য দেয়। তার সাক্ষ্যতে সে বলে—'ঐ সময় প্রতিদিন বিকাল প্রায় ৩টার সময় বিবাদী বি. এন. পাল বোর্ডিং-হাউসে আসতো ও যে-রুমে এনা মোহন একা থাকতো, সেই রুমে ঢুকে যেতো। পর-দিন সকাল পর্যন্ত তারা উভয়ে ঐ কামরায় কাটাতো। আমার ওপর নির্দেশ ছিল প্রতিদিন সকাল ৬টার সময় উভয়ের জন্য ঐ কামরায় প্রাতঃকালীন চা পরিবেশন করা। সেই ভাবেই আমি তাদের বেড-টি দিয়ে আসতাম।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যতদিন পাল রাঁচিতে ছিল সেই সময় সে প্রতিদিন এনা মোহনের কামরায় রাত্রি যাপন করতো। অনুরূপ অবস্থায় তারা যে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হতো তা নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হয়েছে বলা যায়।'

এছাড়া ১৯৩৮ সালের ২৯-৩০ মার্চ রাতে এনা মোহন ও ২ নং বিবাদী লালভানী একই কামরায় রাত্রি যাপন করেছিল সে-সম্বন্ধে কোর্ট যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ পেয়েছে। তাই ধরে নেয়া যায় যে, ঐ পরিবেশে উভয়ে সে-রাতেও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বাদীর আনীত ১৮টি ব্যভিচারের অভিযোগের মধ্যে অন্তত উপরোক্ত দুটি অভিযোগ সম্পর্কে কোর্ট নিঃসন্দেহ হয়েছে। এর একটি ঘটেছিল রাঁচিতে বিবাদী বি. এন. পালের সঙ্গে ; আর অন্যটি এইচ. কে. লালভানীর সঙ্গে। এর বহুপূর্বে, অর্থাৎ ১৯৩২ সালে এনা মোহন বিবাদী মেন-নের সঙ্গে যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, কোর্ট সে-ব্যাপারে এতদিন পর বিচার বিবেচনা করতে অস্বীকার করে, কারণ ঐ ঘটনার পরও বহু বৎসর যাবত বাদী তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করেছেন। তাই ধরে

নেয়া যায়, স্ত্রীর ঐ পদস্খলনের অপরাধ স্বামী নিরঞ্জন আগেই ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন আর মেননের বিরুদ্ধে ঐ অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু যেহেতু বাদী নিরঞ্জন দাস স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণ করতে পেরেছেন, তাই মাননীয় আদালত ইণ্ডিয়ান ডাইভোর্স অ্যাক্টের ১৬ ও ৫৫ ধারা অনুযায়ী তাঁদের বিবাহ রদ করে বিচ্ছেদের ডিক্রী প্রদান করেন।

অতঃপর বিবেচনায় আসে বাদীর প্রার্থিত ক্ষতিপূরণের ব্যাপারটি। এ সম্পর্কে মহামান্য হাইকোর্ট এই মত পোষণ করেন যে, বাদী অবশ্যই এই কেসে ক্ষতিপূরণ পাবেন। তবে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক নিরূপণ করতে গিয়ে শাস্তি বা জরিমানা হিসেবে ঐ অঙ্ক ধার্য না করে বরং প্রকৃত ক্ষতিপূরণ হিসেবে টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে হবে।

এ কথা সত্যি যে, এ ক্ষেত্রে বিবাদীর কার্যকলাপের কারণেই বাদী তাঁর স্ত্রী ও পাঁচ সন্তানের জননী এনা মোহনকে হারাতে বসেছেন। প্রথমে দেখতে হবে স্ত্রীকে হারাবার কারণে স্বামীর আর্থিক কতখানি ক্ষতি হচ্ছে। এখানে দেখা যায়, এনা মোহন তার ধনী পিতার পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে নগদ ৫০,০০০ টাকারও বেশি লাভ করেছিল। তার ওপর সে কলকাতা শহরে কয়েকটি বাড়িরও মালিক। তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার খরচ স্ত্রী তার আয় থেকেই বহন করতো—এ কথা উভয় পক্ষই স্বীকার করেছে। তাই কেবলমাত্র এ বাবদ যদি মাসিক ১০ টাকা হিসাবে ক্ষতিপূরণ ধরা হয় তবে ২০ বৎসর এই হিসেবে স্বামী-স্ত্রীর নিকট হতে ২৪০০ টাকা লাভ করতো বলে ধরা যায়। অবশ্য এই ক্ষতিপূরণের সঙ্গে আরও যোগ করতে হবে, স্বামীর মানসিক অশান্তি, তাঁর বৈবাহিক জীবনের ওপর

Mamun Academy

কঠিন আঘাত ও তাঁর সাংসারিক ব্যবস্থার ওলট-পালট, আর সর্বোপরি সমাজের চোখে তাঁর মানহানির জন্যও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, উপরোক্ত দুই বিবাদীর সঙ্গে স্ত্রীর মেলামেশার অনেক আগে থেকেই বাদী তাঁর স্ত্রীর চরিত্র ও চালচলনে প্রচুর আঘাত পেয়েছিলেন। তবুও মান-সম্ভ্রম ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই বাদী তখন সে-সব সমস্যার মিটমাট করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরই আবার পাল ও লালভানীর পাল্লায় পড়ে তাঁর স্ত্রী পুনরায় বিপথগামী হয়, আর সেই সঙ্গে বাদীর সংসার চিরতরে ভেঙে যায়। ফলে বাদী অবশ্যই ভয়ানক মানসিক আঘাত পেয়েছেন, সমাজে ও বন্ধুমহলে তাঁর মানসম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে। এ-বাবদও বাদী ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

এইসব বিবেচনা করে মাননীয় বিচারপতি ১ ও ২ নং বিবাদী পাল ও লালভানীর বিরুদ্ধে মোট তিন হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের ডিক্রী দেন এবং উভয় বিবাদী উক্ত টাকা সম অংশে প্রদান করবে। এছাড়া আপীল ও মামলার খরচ বাবদ বিবাদীদ্বয় বাদীকে সাতটি স্বর্ণ মুদ্রা ও পাঁচ শত টাকা দিতে বাধ্য থাকবে। আপাতত বাদীকে তাঁর সন্তানদের নিজ হেফাজতে রাখার অধিকারও দেয়া হয়।

মাননীয় হাইকোর্টের রায়ে আরও বলা হয় যে, দেখা যাচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ হবার পর স্ত্রী এনার নিজস্ব বেশকিছু মূল্যবান সম্পত্তি থাকবে। সেই সম্পত্তির ওপর তার সন্তানদের স্বাভাবিক অবস্থায় অধিকারও থাকবে। Indian Divorce Act-এর ৩৯ নং ধারার বিধান মতে হাইকোর্টকে এ সম্পর্কেও যথাযথ আদেশ দেবার অধিকার দেয়া হয়েছে। তাই আদেশ দেয়া হলো, যে পর্যন্ত এনা

Mamun Academy

মোহনের সম্পত্তিতে সন্তানদের প্রকৃত অংশ নির্ধারিত না হয়, তত-দিন তাদের মা ঐ সম্পত্তি কোর্টের বিনা অনুমতিতে কোনোপ্রকার দান, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদি করতে পারবে না। এই মর্মে মাননীয় উচ্চ আদালত এনা মোহনের ওপর এক নিষেধাজ্ঞাও জারি করেন।

Mamun Academy

নীহার বানু হত্যা

প্রচণ্ড শীত পড়েছিল সেবার রাজশাহীতে।

১৯৭৬ সালের ২৭শে জানুয়ারীর সকাল। নীহার বানু তখনও ঘুমে আচ্ছন্ন। ওর বোন ডাঃ মঞ্জিলা বেগম ডেকে তুললেন তাকে, মনে করিয়ে দিলেন—ইউনিভারসিটি যাবার প্রথম বাস আজ ধরতে হবে। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে সাজগোজ করে প্রস্তুত হতে লাগলো নীহার বানু, আর সেই সঙ্গে কান পেতে রইলো বাস আসার শব্দ পাওয়া যায় কিনা। খাবার সময়ও তখন তার নেই। কিন্তু ছোট বোন সাহারা জোর করে তাকে সামান্য কিছু খাইয়ে দিল। এর মধ্যে নিচে ভার্সিটির বাসের শব্দ পেয়েই দ্রুতপায়ে এসে বাসে উঠে বসলো নীহার বানু। কে তখন জানতো যে এটাই তার শেষ যাত্রা।

নীহার ও বাবু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শেষ বর্ষ অনার্স ক্লাসের সহপাঠী। সুন্দরী,সদালাপী নীহার বানু ছিল ছাত্র-শিক্ষক সবার কাছেই সুপরিচিতা। ভালো নাচতেও পারতো সে। অন্যদিকে ধনীর সন্তান আহমদ হোসেন বাবু ছিল চৌকস ফুটবল খেলোয়াড়। এছাড়া সাঁতার ও ওয়াটার পোলোর নামকরা খেলোয়াড় হিসেবেও ভার্সিটির ছাত্র-শিক্ষক সবার ওপরই প্রচুর প্রভাব ছিল তার। ছাত্র মহলে সবাই জানতো, অধ্যাপকদের কাছ

Muktir Academy

থেকে বাবুর আনা পরীক্ষার সাজেশনগুলো (Suggestions) খুবই ফলপ্রসূ হয়।

এই ঘটনার এক বৎসর আগে অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে অনার্স পরীক্ষার আগে নীহার বানু বাবুর কাছে পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নের কিছু সাজেশন চায়। বাবুও আগ্রহের সাথে সুন্দরী ঐ সহপাঠিনীকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই থেকেই তাদের পরিচয় গভীর হয়। বাবু এই সুযোগে নীহারদের বাসায় যাতায়াত শুরু করে। নীহারের মাকে সে খালা ও বড় বোনকে আপা বলে ডাকতো। এবং ক্লাসের সবার কাছে বলে বেড়াতো যে নীহার তার খালাতো বোন হয়। নীহারও বাবুকে ভাই বলে ডাকতো, এবং সেভাবেই সে দেখতো তাকে। ক্যাম্পাসে কিন্তু নীহার ও বাবুর ঘনিষ্ঠতা দেখে তাদের বন্ধু-বান্ধবেরা অনেক সময় ঠাট্টা করতো এই বলে যে খালাতো ভাই-বোন সম্পর্কের আড়ালে ওরা আসলে প্রেমিক -প্রেমিকা। নীহার কিন্তু এ কথায় বরাবরই ঘোর আপত্তি করতো। বাবুকে সে কখনো ঐ চোখে দেখতো না, এবং ওদের মধ্যে প্রকৃতই ভাই-বোনের সম্পর্ক বিদ্যমান বলে সবাইকে বলতো।

হত্যাকাণ্ডের কিছুদিন আগে ক্যাম্পাসে বাবু একদিন নীহারকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলো। এতে রেগে গিয়ে নীহার ঘৃণাভরে বললো—'বোনকে যে বিয়ে করতে পারে, সে মাকেও বিয়ে করতে পারে।' বাবু ওর কঠিন মনোভাবের কথা বুঝতে পেরে প্রসঙ্গটি তখনকার মতো এড়িয়ে যায়।

এদিকে নওগাঁর এক ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সঙ্গে নীহার বানুর বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। নীহারেরও ছেলে দেখে পছন্দ হয়েছে। একথা শুনে বাবু আরও মরিয়া হয়ে উঠলো—যেভাবেই হোক

Mamun Academy

নীহারকে সে বিয়ে করবেই। সে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে এ নিয়ে শলাপরামর্শ শুরু করে দিল। ওরা ঠিক করলো, জোর করে হলেও বাবুর সঙ্গে নীহারের বিয়ে দিতে হবে। নীহারকে না পেলে বাবু নাকি বাঁচবে না। তাছাড়া বাবু তার কল্পনার প্রেয়সীকে অন্যের ঘরনী হতেও দেবে না। যেভাবেই হোক কার্যোদ্ধার করতেই হবে।

প্রত্যেক নতুন বৎসরের প্রথমদিন ছাত্রদের মধ্যে সখের খেতাব বিতরণের এক প্রথা চালু আছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। ১৯৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী বাবুর নামে দেওয়াল পত্রিকায় খেতাব বেরুল—'অনেক সাধের নীহার আমার বাঁধন কেটে যায়।' ওদের মেলামেশা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রসাল এক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। এতে বাবু আরও ক্ষেপে গিয়ে তাড়াতাড়ি একটা কিছু করে ফেলতে সংকল্পবদ্ধ হলো। তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও এতে তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। সে বৎসর ২৫-শে জানুয়ারী ওদের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা পিকনিকে যাবে পদ্মা নদীর পারে সারদায়। নীহারও যাবে ঐ পিকনিকে। কিন্তু বাবু নীহারকে ডেকে ঐ পিকনিকে যেতে বারণ করলো। নীহার সে-মানা শোনেনি। এজন্যে বাবুও গেল সেদিন ঐ পিকনিকে। কিন্তু সেখানে গিয়ে নীহার বাবুর সঙ্গে একবারও কথা বলেনি। এতেও বাবু ভয়ানক অপমানিত বোধ করে ও রেগে যায়।

২৭শে জানুয়ারী বাসা থেকে সকাল ৮টায় ভার্সিটি বাসে করে নীহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। ১১ টার আগেই সেদিন তাদের ক্লাস শেষ হয়ে যায়। ক্লাস শেষে নীহার ও তার ক্লাসমেট নাজনীন জাহান বাসায় ফেরার জন্য বাস ধরতে দৌড়ে আসে, কিন্তু অল্পের জন্য তারা ১১-১০ মিনিটের বাসটি হারায়। এমন সময় পেছন থেকে

Mamun Academy

বাবু নীহারকে ডাক দেয়। পরবর্তী বাস ছাড়তে দেরি আছে, তাই নাজনীন ওখানেই অপেক্ষা করে আর নীহার বাবুর ডাকে তার দিকে এগিয়ে যায়। বাবু নীহারকে একপাশে ডেকে নিয়ে তার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ শুরু করে দেয়। নাজনীন ওর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ১২-৩০ মিনিটের বাসটিও মিস করে। এরপর ১-১০ মিনিটের বাসও ছাড়ার সময় হলে নাজনীন নীহারকে ডাকে। নীহার তখন নাজনীনকে ঐ বাসে করে চলে যেতে বলে এবং সে পরে আসবে বলে জানায়, নাজনীন একা একাই বাসে করে শহরে চলে আসে। এরপর দেখা গেছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নীহার ও বাবুকে দুটি আলাদা রিক্সা করে রাজশাহী শহরের দিকে আসতে। কিন্তু তারপর থেকে নীহারকে আর দেখা যায়নি কখনও।

এদিকে বিকেল গড়িয়ে রাত হয়ে এলো। তবুও নীহার ফিরছে না দেখে তার বাসার সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। ওর মা ও বোনেরা ভাবে, কখনো তো নীহার ভার্সিটি থেকে ফিরতে এত দেরি করে না! একে একে ওদিকের সব বাস চলে গেল, তবুও ওর দেখা নেই। বাসার সবাই দুশ্চিন্তায় অস্থির, পথে কোনো অ্যাকসিডেন্ট হলো না তো? সারা রাতের ভেতরেও নীহার ফিরলো না। বিনিদ্র রজনী কাটলো মা-বোনদের। এমন কি পরদিন ২৮শে জানুয়ারীও নীহার ফিরে এলো না। ২৯ তারিখে নীহারদের পারিবারিক বন্ধু রাজশাহীর তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ খাদেমুল ইসলাম নীহারের খোঁজে এলেন রাজশাহী ইউনিভারসিটিতে। সেখানে খোঁজ নিয়ে জানা গেল,—২৭ তারিখ সকালে নীহার ও বাবু ক্লাসে উপস্থিত ছিল, কিন্তু ২৮ তারিখে দুজনের কেউই ক্লাসে আসেনি। তবে ২৯ তারিখে শুধু বাবু ক্লাসে আসে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রাষ্ট্র

Mamun Academy

বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ডাঃ এ. এন. শামসুল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করে সব বললে তিনি বাবুকে ক্লাস থেকে ডেকে পাঠান। বাবু তখন ক্লাসেই ছিল, কিন্তু সে তাঁদের কাছে না এসে পালিয়ে রইলো। অনেক খোঁজ করেও আর পাওয়া গেল না তাকে।

অতঃপর ৩০শে জানুয়ারী ডাঃ মঞ্জিলা বেগম রাজশাহীর পবা থানায় একটি এজাহার দিলেন। তাতে তিনি বললেন, নীহারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাবু তাকে জোর করে নাটোর নিয়ে গেছে বলে মনে হয়। পরদিন ডাঃ মঞ্জিলা রাজশাহী সদর এস.ডি.ও-র কাছে একটি লিখিত বিবরণে নিরুদ্দেশ হওয়ার সময় নীহারের পরনের পোশাক পরিচ্ছদ ও তার সঙ্গের জিনিসের একটি তালিকা দিয়ে আসেন। তাতে বলা হয়, সেদিন নীহারের পরনে ছিল একটি খয়েরী রঙের হলুদ চেক শাড়ি, গায়ে নীল পশমী কোট, হাতে সবুজ রঙের একটি পার্স, হলুদ রঙের ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার ও পেটিকোট। গলায় কালো রঙের সুতোয় বাঁধা একটি তাবিজ, হাতে ঘড়ি। সে-সময় তার ঋতু-স্রাব চলছিল বলেও ঐ বিবরণে জানানো হয়।

নীহারদের পৈতৃক বাড়ি ছিল দিনাজপুর জেলায়। তার পিতা জনাব নজিবর রহমান কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের সহকারী রেজি-স্ট্রার হিসেবে ১৯৭১ সালে রাজশাহীতে চাকুরীরত ছিলেন। তাঁর পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে নীহার ছিল দ্বিতীয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নিরাপত্তার আশায় তিনি শহর থেকে ২০ মাইল দূরে চারঘাটে আশ্রয় নেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানেই তিনি ১৩ই এপ্রিল হানাদার বাহিনীর গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হন ও পরদিন শাহাদৎ বরণ করেন। এরপর থেকে তাঁর পরিবারের সবাই রাজশাহী শহরেই বসবাস করে আসছিল। বড় বোন মঞ্জিলা

Mamun Academy

ডাক্তারী পাশ করে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে চাকুরীরত ছিলেন। তাঁর সঙ্গেই থাকতো নীহারসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। পিতার মর্মান্তিক ও অকাল মৃত্যুর শোক কাটিয়ে যখন তারা কেবল প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ই নেমে এলো নীহারকে কেন্দ্র করে আর এক দুঃখ ও শোকের ছায়া।

প্রথম দিকে কিন্তু পুলিশ নীহার বানুর অন্তর্ধানের ব্যাপারটিকে বিশেষ কোনো গুরুত্ব দেয়নি। এজাহার পাবার পর পবা থানা থেকে কেবল নাটোর পুলিশকে ফোন করে ওদের খোঁজ করার জন্য বলা হয়। তখন অনেকেই ভেবেছিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেকার অনেক প্রেমের উপাখ্যানের মতো হয়তো নীহারও বাবুর সঙ্গে স্বেচ্ছায় পালিয়ে গিয়ে অন্যত্র গা ঢাকা দিয়েছে, একদিন আবার স্বামী-স্ত্রী রূপে এসে হাজির হবে।

কিন্তু যতই দিন পেরিয়ে যেতে লাগলো ততই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জোর গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, নীহার বানুকে হত্যা করে তার লাশ গুম করা হয়েছে। ভার্সিটির ছাত্রী মহলে এ নিয়ে বেশ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলো। শিক্ষক মহল ও অভিভাবকেরাও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। একদিন ছাত্রীরা এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে এক মিছিলও বের করলো।

অতঃপর ঘটনার চার মাস পরে রাজশাহীর এম. পি-র আদেশে সি.আই. ডি.ইন্সপেক্টর মিঃ আহাম্মদ কাইউম বক্স ২৪-৫-৭৬ তারিখে এই মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেন। দক্ষতার সাথে গোপনসূত্র ধরে এগিয়ে তিনি ৩১ মে এই মামলার অন্যতম প্রধান আসামী শহীদুল ইসলামকে গ্রেফতার করেন (বিচারে এর প্রাণদণ্ড হয়।) এরপর ৭ই জুন অন্য এক আসামী এনামুল হককে গ্রেফতার করা হয়

Mamun Academy

(পরবর্তী কালে তাকে রাজসাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা হয়)। এরা দুজনেই ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও বাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রথমে শহীদুলের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী মিঃ কাইউম তাকে নিয়ে রাজশাহী শহরের হেতেম খাঁ-য় অবস্থিত ঘটনাস্থল 'মিনা মঞ্জিলে' যান ও স্থানটি দেখে আসেন। এনামুল হককে গ্রেফতারের পর তার কাছেও একই রকম স্বীকারোক্তি পেয়ে তদন্তকারী অফিসার একজন ম্যাজিস্ট্রেট, একজন ডাক্তার, নীহারের কয়েকজন আত্মীয়, ও উপরোক্ত দু'জন আসামী সহ ১২-৬-৭৬ তারিখে মিনা মঞ্জিলে আসেন। সেখানে প্রায় ৩০-৪০ জন লোকের উপস্থিতিতে উক্ত আসামীদ্বয় ঐ বাড়ির উঠনে একটি ১০ ফুট × ৬ ফুট পাকা করা স্থান দেখিয়ে বলে যে, তারা নীহার বানুকে হত্যা করে তার লাশ ঐখানে পুঁতে রেখে জায়গাটি পাকা করে দিয়েছে। অতঃপর উপস্থিত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তখনই ঐ পাকা প্ল্যাটফর্ম ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল খোঁড়ার কাজ। উপস্থিত সবাই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় চেয়ে রইলো ঐদিকে। সিমেন্টের প্লাস্টার ভেঙে ইট ও কিছু মাটি উঠাবার পরই বেরিয়ে এলো এক নরকঙ্কাল। তা দেখে সবাই আঁতকে উঠলো। নীহারের ভাই কাছে গিয়ে দেখেই কেঁদে উঠে বললো, 'এই তো আমার নীহার!'

সাবধানে ওপরে তোলা হলো কঙ্কালটি। শুধু হাড়ের কাঠামো ছাড়া লাশের সব অংশই প্রায় গলিত ছিল। লাশের সাথে কিছুটা লেগে থাকা, কিছুটা আলগা দুই ইঞ্চি চওড়া একটি চুলের বেণীও ছিল। ওর মাথার খুলি ও মেরুদণ্ড কিন্তু অবিকৃত অবস্থায় ছিল। লাশের সাথে তার পরিধেয় কাপড় চোপড়ের অংশবিশেষ ও একটি তাবিজ পাওয়া গেল। আরও পাওয়া গেল একটি স্যানিটারী প্যাড

যাতে বোঝা যায়, নিহত মহিলার মৃত্যুর সময় তার ঋতুস্রাব চলছিল।

উপস্থিত ডাক্তার ওখানেই মৃতের দাঁত, মাথার খুলি, হিপ বোন ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে মত দিলেন যে, কঙ্কালটি ২০ থেকে ২৪ বৎসর বয়সের এক মহিলার। আর তার মৃত্যু হয়েছিল আনুমানিক পাঁচ মাস পূর্ব। নীহার বানুর উপস্থিত আত্মীয় আবদুর রহমান ও নীহার বানুর ভাই কঙ্কালের সঙ্গে উদ্ধারকৃত জিনিসপত্রগুলি সনাক্ত করে বলেন যে ওগুলিসব নীহার বানুর পরিধেয় ব্যবহৃত জিনিস। আর ঐ লাশটিও নিরুদ্দিষ্ট নীহার বানুর। ডাক্তার সাহেব তাঁর রিপোর্ট তৈরি করে নিলেন। তিনা মঞ্জিলের ভেতর গিয়ে আসামীদের নির্দেশমত ঐ বাড়ির যে ঘরে নীহার বানুকে হত্যা করা হয়েছিল বলে জানান হলো, তার পুব দিকের দেয়ালে তখনও রক্তের ক্ষীণ দাগ দেখা যাচ্ছিল। তদন্তকারী অফিসার তার নমুনাও সংগ্রহ করলেন। লাশের সঙ্গে উদ্ধারকৃত জিনিসগুলিও পুলিশ তাদের হেফাজতে নিয়ে নিল।

নিখোঁজ হওয়ার দীর্ঘ সাড়ে চার মাস পরে নীহার বানুর গলিত লাশ উদ্ধারের ঐ রোমহর্ষক সংবাদ দাবাগ্নির মতো সারা রাজশাহী শহর ও পরে বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। সংবাদপত্রে ও লোকমুখে এটা প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। দেশের আপামর জনসাধারণ, বিশেষভাবে ছাত্রীদের অভিভাবকেরা আঁতকে উঠলো এই খবর শুনে।

সি. আই. ডি. পুলিশ এরপর দ্রুত ঘটনার তদন্ত চালিয়ে গেল। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্য তিনজন আসামী এনামুল, ফেতু ও আজিজুরকেও পুলিশ খুঁজে বের করলো। তারা সবাই ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে স্বীকারোক্তিও করলো। ক্রমে আরও কয়েকজন আসামীকে গ্রেফ-

Mamun Academy

তার করা হলো। কিন্তু মামলার প্রধান দুই আসামী আহমদ হোসেন বাবু ও আহসানুল হক পলাতকই রয়ে গেল, অনেক চেষ্টা করেও তাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। তদন্ত শেষে পুলিশ ঐ পলাতক দুই আসামী সহ মোট সাতজন আসামীর বিরুদ্ধে নারী হত্যা ও সেই কাজে সহযোগিতার অভিযোগে চার্জশীট দাখিল করে।

বগুড়া শহরে অবস্থিত তৎকালীন বিশেষ ৭ নং সামরিক আদালতে ১৮ই জুলাই ১৯৭৭ সালে এই চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার শুরু হয়। এই আদালতের চেয়ারম্যান ছিলেন কর্ণেল এম. এ. সালাম। অপর দুই সদস্য ছিলেন মেজর মীর নূরুল ইসলাম ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এম. এ. গনি। দীর্ঘ একুশ দিন ধরে এই মামলার বিচার চলে। এ সময় বাদী পক্ষ থেকে মোট ২৯ জন সাক্ষীকে কোর্টে হাজির করা হয়। তাছাড়া ঘটনার আলামত হিসেবে বহু জিনিস কোর্টে দাখিল করা হয়। আসামী পক্ষ অবশ্য কোন সাফাই সাক্ষী দেয়নি। তবে তারা বাদী পক্ষের সাক্ষীদের দীর্ঘ জেরা করে। এই মামলার অন্যতম প্রধান আসামী এনামুল হক সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে 'রাজসাক্ষী' (Approver) হয়ে হত্যাকাণ্ডের সমগ্র ঘটনা প্রকাশ করার আবেদন করলে সরকার পক্ষের অনুমোদনক্রমে আদালত তাকে ক্ষমা ঘোষণা করে রাজসাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশ্য যদি সে কোনোকিছু না লুকিয়ে সমগ্র সত্য ঘটনা অকপটে কোর্টে প্রকাশ করে তবেই সে ক্ষমার আওতায় আসবে। বিচার চলাকালীন প্রধানত রাজসাক্ষী ও অন্যান্য সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরার মাধ্যমে এই রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের যে কাহিনী আত্মপ্রকাশ করলো তা এরকম :

MamunAcademy

আহমদ হোসেন বাবু তার সহপাঠিনী নীহার বানুকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে আগে থেকেই ভাই-বোনের সম্পর্ক থাকাতে সে এই প্রস্তাব নীহারদের পরিবারের কাউকে দিতে পারছিল না। তাছাড়া নীহার নিজেই ছিল এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী। ইতিমধ্যে এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে নীহারের বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় বাবু আরও নিরুপায় হয়ে উঠলো। সে তখন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও হলমেট আহসানুল হক, শহীদুল ইসলাম নীলু ও এনামুল হকের (রাজসাহী) সঙ্গে ২৩শে জানুয়ারী তার হোস্টেল কক্ষে এক গোপন আলোচনায় মিলিত হয়। সেখানে তারা প্রথমে স্থির করে যে ২৫শে জানুয়ারী ওরা কেউ পিকনিকে না গিয়ে নীহারকে একটি দাওয়াতে যোগদানের জন্যে মিথ্যা কথা বলে মিনা মঞ্জিলে নিয়ে আসবে। আর সেখানেই জোর করে হলেও নীহারকে বাবুর সঙ্গে বিয়ে দেয়া হবে। সেই সময় মিনা মঞ্জিলে কোনো ভাড়াটিয়া থাকতো না। আহসান ছিল ঐ বাড়ির মালিকের আত্মীয়। সেই মিনা মঞ্জিলের চাবি সংগ্রহ করে রাখার দায়িত্ব নেয়। কিন্তু ২৫ তারিখে বাবুর বাধা সত্ত্বেও নীহার সারদায় পিকনিক করতে চলে যাওয়ায় ওদের এই প্রোগ্রাম ভণ্ডুল হয়ে যায়।

২৬শে জানুয়ারী বিকেলে ওরা আবার বাবুর রুমে শলাপরামর্শে বসে। এবার ওরা ঠিক করলো যে পরদিন দুপুরে ক্লাস শেষে বাবু নীহারকে দাওয়াতের অজুহাতে ভুলিয়ে মিনা মঞ্জিলে নিয়ে আসবে। বাবুর বন্ধুরা আগে থেকেই মিনা মঞ্জিলে উপস্থিত থাকবে। সেখানে বসেই তারা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করবে। বাবু বললো, যদি নীহার তাকে বিয়ে করতে শেষ পর্যন্ত রাজি না হয় তবে তাকে মেরে ফেলা হবে। অন্যের ঘরনী সে নীহারকে হতে দেবে না। অন্য বন্ধুরাও

Mamun Academy

এতে সায় দিল। ২৭-১ তারিখে যথাসময়ে আহসান ও এনামুল আগেই এসে মিনা মঞ্জিলে অপেক্ষা করতে থাকে। ওদের পর শহীদুল ইসলামও সেখানে পৌঁছে যায়। ওরা অপেক্ষা করতে থাকে বাবু ও নীহারের জন্য। দুপুর দেড়টার দিকে বাবু ও নীহার দুটি আলাদা রিক্সায় সেখানে পৌঁছে। এরপর সবাই ঐ বাড়ির একটি কামরায় এসে জমায়েত হলো। নীহার বানু সেখানে ঢোকার পর-পরই ঐ ঘরের সব জানালা দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। ওদের হাব-ভাব দেখে শঙ্কাজড়িত দৃষ্টিতে নীহার তাদের দিকে তাকালো। বাবু তখনই নীহারকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে বসলো। হঠাৎ এখানে এ প্রস্তাব শুনে রেগে গিয়ে নীহার বলে—'আপনি এসব কি বাজে কথা বলছেন? আত্মীয় বাড়িতে দাওয়াতের কথা বলে আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন? আপনার সঙ্গে আমার ভাইবোনের সম্পর্ক, সেটা ভুলবেন না।'

কিন্তু বাবু ওর কথায় কান না দিয়ে আবারও বিয়ের কথা বললে নীহার তখন চিৎকার করে আশেপাশের লোক ডাকার ভয় দেখালো। বাবু সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে নীহারের শাড়ির আঁচল আলগা করে, তাই দিয়ে নীহারের গলায় প্যাঁচ দিয়ে শাড়ির পাড়ের দুই প্রান্ত দু'হাতে শক্ত করে ধরে বললো—'এখনও সময় আছে—রাজি হয়ে যাও, না হলে তোমাকে আর ফিরে যেতে দেবো না এখান থেকে।'

কিন্তু নীহার এবারও দৃঢ়তা ও ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলো এই প্রস্তাব। বাবু তখন শক্ত হাতে শাড়ির দুই পাড় ওর গলায় কষতে লাগলো। এ সময় সেখানে উপস্থিত বাবুর তিন বন্ধু মারাত্মক পরিণতির কথা চিন্তা করে নীহারকে অনুরোধ করলো বাবুর প্রস্তা-

Mamun Academy

বে রাজি হয়ে যেতে। না হলে প্রাণ নিয়ে সে এখান থেকে আর ফিরে যেতে পারবে না বলে তারাও নীহারকে ভয় দেখালো। এত ভয়-ভীতির পরও কিন্তু নীহার কিছুতেই রাজি হলো না বাবুকে বিয়ে করতে। রেগে গিয়ে বাবু আরও শক্ত করে নীহারের গলায় তার শাড়ির ফাঁস পেঁচিয়ে বলতে থাকে—'এখনও রাজি হও যদি বাঁচতে চাও, এখনও সময় আছে।' এ সময় আত্মরক্ষার তাগিদে নীহার হঠাৎ বাবুর ডান হাতে এক কামড় বসিয়ে দিল। দাঁত বসে গিয়ে রক্তও বেরুলো সেখানে। এদিকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মুক্তির আশায় নীহার ভীষণ ভাবে তার হাত-পা ছুঁড়ছিল। বাবুর পক্ষে তখন একা তাকে বাগে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। এই সময় তার তিন সঙ্গী এনামুল, আহসান ও শহীদুল এগিয়ে এলো বাবুর সাহায্যে। ওরা নীহারের দুই হাত শক্ত করে চেপে ধরে রাখলো যাতে সে নড়াচড়া না করতে পারে। চারজন যুবকের প্রচণ্ড শক্তির চাপে এবার নীহার আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়লো। বাবু তখন আরও শক্ত করে শাড়ির আঁচল প্যাঁচাতে থাকে ওর গলায়। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই নীহার বানুর শরীর অসাড় হয়ে ঢলে পড়বার উপক্রম হলো। তখন সবাই তাকে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিল। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

সেদিনের সেই ঘটনার বিশদ বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শী ও সহযোগী রাজসাক্ষী এনামুল যখন কোর্টে তার জবানবন্দীতে বলে চলছিল,—কিভাবে এক তরুণী সহপাঠিনীকে এক নির্জন ঘরে আটকে রেখে চার বন্ধু মিলে নৃশংসভাবে হত্যা করে, কোর্টের উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে শুনছিল সেই হৃদয় বিদারক কাহিনী।

মৃত নীহারের লাশ সামনে রেখে চার বন্ধু ওখানে বসেই ঠিক

করলো, এই ঘটনা যাতে কেউ ঘুণাক্ষরেও টের না পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। লাশটিও গুম করতে হবে। ঠিক হলো আপাততঃ লাশটি ঐ ঘরের মধ্যেই তালা দিয়ে রেখে সবাই হলে ফিরে যাবে, বিকেল বেলা রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ক্যান্টিনে এরা সবাই আবার মিলিত হয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে। সবাই তখন বেরিয়ে এলো মিনা মঞ্জিলে তালা লাগিয়ে।

বিকেলে সবাই একে একে এসে জড়ো হলো ক্যান্টিনের এক নির্জন কোণে। এবার আহসান তার বন্ধু আজিজুরকেও সঙ্গে নিয়ে এলো। আর এক বন্ধু রুহুল আমিন ফেতুও ওদের সঙ্গে শলাপরা-মর্শে যোগ দিল। ওখানে বেশি কথা না বলে সবাই মিনা মঞ্জিলের দিকে রওনা হলো। পথে ফেতু ও আজিজুরকে ওরা সব ঘটনা বলে সতর্ক করে দিল অন্য কেউ যেন এসব কথা একবর্ণও না জানতে পারে। আর যদি কেউ এ-কথা ফাঁস করে তবে তাকেও শেষ করা হবে।

ওরা ছয়জন মিনা মঞ্জিলে এসে লাশ গুম করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলো। ঠিক হলো, লাশ এখান থেকে সরা-নোর জন্য একটি বড় স্টীলের ট্রাঙ্ক আনতে হবে। এনামুল, ফেতু ও নীলু সন্ধ্যার আগে বাজারে গেল ট্রাঙ্ক কিনতে। কিন্তু সারা বাজার খুঁজেও লাশ ঢুকাবার মতো অতবড় ট্রাঙ্ক তারা খুঁজে পেল না। তখন তারা সাহেব বাজারের সিরাজুল ইসলামের দোকান থেকে একটি তিরিশ ইঞ্চির কালো ট্রাঙ্ক কিনে নিয়ে এলো। ঐ ট্রাঙ্কে নীহারের লাশটি ভরতে গিয়ে দেখা দিল আর এক বিপদ—এরই মধ্যে লাশ ভয়ানক শক্ত হয়ে গিয়েছিল। সবাই অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই সেই লাশ ঐ ট্রাঙ্কের মধ্যে ঢোকাতে পারলো না। মৃত নীহারকে

নিয়ে ঐ শীতেও ওরা সবাই ঘেমে উঠলো। এবার সবাই মিলে ঠিক করলো, মিনা মঞ্জিলের উঠনের খালি জায়গাটিতেই ঐ লাশ পুঁতে ফেলতে হবে। এ কাজে দেরি হলে আরও বিপদ দেখা দিতে পারে। মাটি খোঁড়ার জন্য ফেতু একটি শাবল নিয়ে এলো পাশের বাড়ি থেকে। সবাই এবার লেগে গেল উঠনে গর্ত খুঁড়তে। বাবু ও আহসান নীহারের হাতের ঘড়ি ও কানের টব্ খুলে নিল। ওর কলম এবং পার্সও তারা রেখে দিল। তারপর পরনের কাপড় চোপড়সহ ঐ গর্তের মধ্যে শুইয়ে তাকে মাটি চাপা দেয়া হলো, সন্দেহমুক্ত ও লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার জন্য ওপরে কিছু জঙ্গল ও আবর্জনা টেনে জায়গাটি ঢেকে দেয়া হলো। কিন্তু এতেও ওরা নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। বাবু বললো, সম্পূর্ণ জায়গাটি ইঁট ও সিমেন্ট দিয়ে পাকা করে দিতে হবে যাতে কেউ ভাবতেও না পারে, এখানে কোনো লাশ পোঁতা আছে। বাবু পকেট থেকে অগ্রণী ব্যাংকের একটি চেক বই বের করে ১৬ শত টাকার একটি চেক সই করে তা শহীদুলের হাতে দিয়ে বললো—'এই টাকা দিয়ে খুব বিশ্বাসী রাজমিস্ত্রী এনে গর্তের সম্পূর্ণ জায়গাটি সিমেন্ট-প্লাস্টারিং করে দিতে হবে। শহীদুল এতে রাজি হয়ে চেকটি নিল।

শহীদুলের নির্দেশমত ২রা ফেব্রুয়ারী রুহুল আমিন ফেতু ৩০ মাইল দূরবর্তী চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকে এক বস্তা সিমেন্ট কিনে নিয়ে এলো মিনা মঞ্জিলে। ফেতু নবাবগঞ্জ থেকেই তার স্বগ্রামবাসী রাজমিস্ত্রী আলাউদ্দীনকে নিয়ে মিনা মঞ্জিলে এলো ৪ঠা জানুয়ারী। প্রয়োজনীয় বালুও কেনা হলো। ঐ বাড়িতেই কিছু ইঁট ছিল, তা দিয়েই পাকা করার কাজ সারা হবে বলে ঠিক হলো। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টায় সবাই এলো ঐ বাড়িতে। এদিকে ২রা ফেব্রুয়ারী থেকে নতুন

ভাড়াটিয়া, ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ অফিসের সহকারী মিঃ মুজিবর রহমান তাঁর এক ছোট ভাইসহ ঐ বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। তাঁকে বলা হলো, গোসলের সুবিধার জন্য উঠনের ঐ স্থানটির জঞ্জাল সরিয়ে পাকা করে দিচ্ছে ওরা। রাজমিস্ত্রীকেও সেই কথাই বলা হলো। ফেতু ও ওয়াহেদুল জোগালদারের কাজ শুরু করলো। সকাল ৮টা থেকে ১ টার মধ্যেই ওরা তিনজনে নীহারের লাশের উপরিভাগের জায়গাটি ঘিরে ১৫ ফুট × ৬ ফুটের একটি পাকা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে ফেললো। আসামীরা এবার ঘটনাটি ভালোভাবে চাপা দেয়া হয়েছে মনে করে নিশ্চিন্ত হলো।

কিন্তু কথায় বলে 'পাপ কখনো চাপা থাকে না'। সময়ের আবর্তনে যখন সবাই প্রায় ভুলে যাচ্ছিল তার স্মৃতি ঠিক তখনই বোধহয় নীহারের অতৃপ্ত আত্মা ভাসিটির আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছিল তার করুণ ফরিয়াদ। এতদিন পরে ভাসিটির ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এক জোর গুজব যে নীহারকে হত্যা করা হয়েছে। কিভাবে এই গুজব বেরুলো তা কেউ সঠিক বলতে পারে না।

বাবু কিন্তু ২৯শে জানুয়ারীর পর আর ক্লাসে আসেনি। এনামুল অবশ্য সারা এপ্রিল মাস ক্লাস ক'রে গ্রীষ্মের ছুটিতে তার বগুড়ার গ্রামের বাড়িতে চলে গেল। গোপন খবরের সূত্র ধরে পুলিশ সেখান থেকে তাকে ৫ই জুন গ্রেফতার করে রাজশাহী নিয়ে আসে। তার কাছ থেকেই ঘটনার প্রকৃত বিবরণ জানা যায়। পরবর্তী সময়ে সরকার তাকে রাজসাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করে। রাজসাক্ষী হিসেবে কোর্টে এনামুল দীর্ঘ জবানবন্দী ও জেরার সম্মুখীন হয়। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ উকিল রাজশাহীর অ্যাডভোকেট মিঃ গোলাম আরিফ টিপু তাকে

Mamun Academy

দীর্ঘ সাড়ে চার ঘণ্টার ওপর জেরা করেন।

এই মামলার বিচারের সময় প্রধান দুই আসামী, বাবু ও আহসানুল হক সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির পরও কোর্টে হাজির না হওয়ায় তাদের অনুপস্থিতিতেই এই মামলায় তাদেরও বিচার করা হয়। উপস্থিত অন্য আসামীরা সবাই নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করে।

আসামী পক্ষের আত্মপক্ষ সমর্থনে বলা হয় যে নীহার বানু মরেনি, সে এখনও জীবিত আছে। স্বেচ্ছায় বাবুর সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ওরা গোপনে সুখে ঘর সংসার করছে। এর মধ্যে তাদের একটি কন্যা সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছে। এই যুক্তির সমর্থনে আসামী পক্ষের উকিল তৎকালীন দৈনিক বার্তায় প্রকাশিত নীহার বানুর একটি ছবি কোর্টে দাখিল করে বলেন যে, ঐ ছবিতে নীহার বানুর সঙ্গে যে ছোট মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে সেটিই তার মেয়ের ছবি। এর উত্তরে সরকারী উকিল জনাব ফজলুল করিম সঙ্গে সঙ্গে ঐ বক্তব্য খণ্ডন করে অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, ঘটনার আগে তোলা নীহার বানুর সঙ্গে তার চাচাতো বোন ডেইজীর ফটো ওটা। আর যদি নীহার বানু সত্যিই আজ বেঁচে থাকে ও বাবুর সঙ্গে কথিত বিয়ের পরপরই যদি ১৯৭৬ সালেও সে গর্ভ ধারণ করে তবুও তার মেয়ে বড়জোর দেড় বছর বয়সের হতে পারে। কিন্তু ছবিতে নীহারের সাথের মেয়েটির বয়স অনেক বেশি যা ছবির দিকে তাকালেই সহজে বোঝা যায়। আসামী পক্ষ থেকে আরও বলা হয় যে উদ্ধারকৃত লাশটি নীহার বানুর নয়। ওটা অন্য কোনো মহিলার কঙ্কাল। নির্জন মিনা মঞ্জিলের ফাঁকা বাড়িতে তৎকালীন বাসিন্দার সঙ্গে তার যুবতী ঝি বা অন্য কোনো মহিলার অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরে ঘটনাটি জানাজানি হবার আশঙ্কায় ঐ যুব-

Mamun Academy

তীকে গোপনে হত্যা করে ওখানে পুঁতে রাখা হয়। মিনা মঞ্জিল থেকে উদ্ধারকৃত ঐ কঙ্কালটি সেই অপরিচিতা যুবতীরই হবে। এখন আসামীদের মিথ্যা অভিযোগে জড়াবার জন্যই পুলিশ ঐ লাশ নীহার বানুর বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

তবে আসামী পক্ষ তাদের এই যুক্তির স্বপক্ষে কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ আনতে পারেনি। সরকার পক্ষের কোনো সাক্ষীও এসব কথা স্বীকার করেনি। যদিও যুক্তি প্রমাণ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আসামী পক্ষেরই ছিল।

মাননীয় ট্রাইবুনাল তাদের দীর্ঘ ৪০ পৃষ্ঠার রায়ে সাক্ষীসমূহ ও আলামত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উদ্ধারকৃত লাশের সঙ্গে পাওয়া কাপড় চোপড়, চুল, তাবিজ, প্যাড ইত্যাদিও সরকার পক্ষের সাক্ষ্য দ্বারা এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, ওটা নীহার বানুরই লাশ।

বিচার শেষে ২১শে আগস্ট (১৯৭৭ সাল) জনাকীর্ণ কোর্টে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান এই চাঞ্চল্যকর মামলায় তাঁদের রায় ঘোষণা করেন। এই হত্যাকাণ্ডকে তিনি ভয়াবহ, জঘন্যতম ও মর্মান্তিক বলে উল্লেখ করেন। এই কেসে আসামীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত বলেও ট্রাইবুনাল অভিমত ব্যক্ত করেন। সর্বসম্মত রায়ে কোর্ট আসামী আহমদ হোসেন বাবুকে পেনাল কোডের ৩০২ ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত করে চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কোর্ট আসামী শহীদুল ইসলাম নীলু ও আহসানুল হককেও ৩০২/১০৯/২০১ ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত করে তাদেরও মৃত্যুদণ্ডপ্রদান করেন। আসামী রুহুল আমিন ফেতুকে ২০১ ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আসামী আজি-

Mamun Academy

জুর রহমান ও ওয়াহেদুল ইসলামকে অবশ্য নির্দোষ হিসেবে খালাস দেয়া হয়। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বাবু ও আহসানুল হক পলাতক থাকাতে তাদের ফাঁসির আদেশ ওদের গ্রেফতারের পর কার্যকারী করা হবে বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত উপস্থিত আসামী শহীদুল ইসলাম নীলুর পক্ষ থেকে এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে এক রীট আবেদন করা হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ আসামীর ফাঁসির আদেশ স্থগিত রাখা হয়।

অতঃপর ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে দেশে সামরিক আইন জারি হওয়ায়, 'মার্শাল ল'র বিধান অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডের ঐ স্থগিত আদেশ বাতিল বলে গণ্য হয়।

অবশেষে বগুড়ার বিশেষ সামরিক আদালতের রায়ের দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে ১৯৮২ সালের ১৯শে আগস্ট, রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জনের উপস্থিতিতে শহীদুল ইসলাম নীলুকে ফাঁসি দেয়া হয়।

নীলুর এক চাচাতো ভাই ফাঁসির পর তার লাশ জেলখানা থেকে গ্রহণ করে। তার অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও তখন জেল গেটে উপস্থিত ছিল।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপর দুই আসামী বাবু ও আহসানুল হক এখনও পলাতক।

(* সাপ্তাহিক বিচিত্রার ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত আহাম্মদ শফিউদ্দীনের লেখা নিবন্ধ থেকে এই কেসের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। সেজন্য লেখক কৃতজ্ঞ।)

Mamun Academy

গিলোটিন

প্রেমের ব্যবসায় প্যারিসের হেনরী ডিজায়ার ল্যাণ্ড্রু (Henry Desire Landru) মতো একসঙ্গে অতবড় সাফল্য ও নৃশংসতার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। মাত্র পাঁচ বৎসর সময়ের মধ্যে সে ২৮৩ জন মহিলাকে গভীর প্রেমে মজিয়েছে আর তাদের মধ্যে দশ জনকে ঠাণ্ডা মাথায় নিজ হাতে খুনও করেছে। এদের মধ্যে এক প্রেমিকার সঙ্গে সে তার ১৭ বৎসর বয়স্ক ছেলেটিকেও খুন করে।

হেনরী ল্যাণ্ড্রুর পিতা ছিল ফ্রান্সের প্যারিস শহরের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। কিন্তু শেষ জীবনে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে ও শেষে আত্মহত্যা করে নিজ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। শৈশবে ও কৈশোরে হেনরী ছিল একজন বই পাগল মেধাবী ছাত্র। তখন কিন্তু অন্য দশজনের মতই তার স্বভাব ও চালচলন ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার চরিত্রে অপরাধ-প্রবণতা ক্রমে শেকড় গেড়ে বসতে থাকে। ফলে মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও পড়াশুনায় সে আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। জীবনের প্রারম্ভেই দু'দু'-বার সে ধরা পড়ে জালিয়াতি ও ছোটখাটো চুরির দায়ে। আর দু'-বারই তার অল্প মেয়াদের জেল হয়।

১৯১৪ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে মনে মনে এক অভিনব

Mamun Academy

মতলব আঁটলো—এবার আর ছোটখাটো চুরি নয়, সে পাইকারি ভাবে প্রেমের ব্যবসা শুরু করবে। সে-সময় কিন্তু তার এক স্ত্রী ও এক ছেলে বর্তমান ছিল। তাদের সে ভালবাসতো প্রচুর। স্ত্রী-পুত্রের কাছে হেনরী ছিল একজন প্রেমময় স্বামী ও দায়িত্বশীল পিতা। তাদের জন্য শহরে সে একটি আলাদা বাসা ভাড়া করেছিল। এবার স্ত্রী-পুত্রকে সে বোঝালো যে, সে একটি নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে, আর সেই ব্যবসার জন্য শহরের উপকণ্ঠে তাকে আর একটি বাসা ভাড়া নিতে হয়েছে। সুতরাং সেখানে ঐ কাজের তাগিদে তাকে প্রায়ই একনাগাড়ে কয়েকদিন কাটাতে হবে সহকর্মীদের সঙ্গে। অবশ্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে সে স্ত্রী-পুত্রকে দেখাশুনাও করে যাবে।

হেনরীর সেই নতুন বাড়িটির নাম ছিল 'ভিলা-ইরমিটেজ'। শহরের উপকণ্ঠে ভারনোইলেট এলাকায় রেল রোড স্টেশনে একটু নির্জন অঞ্চলে ছিল সেই বিখ্যাত ভিলাটি।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাবে সে-সময় ফরাসীদের নাগরিক ও পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ফ্রান্সে তখন নানা সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। চারদিকেই তখন বিরাজ করছিল একটা অনিশ্চিয়তা ও হতাশার ভাব। সে-সময় শত শত লোক যুদ্ধ ক্ষেত্রে অকালে প্রাণ দেয় বা নিরুদ্দেশ হয়। বোমা ও গোলাগুলির আঘাতে অনেকে আবার সারা জীবনের মতো পঙ্গুও হয়ে গিয়েছিল। এসব কারণে অনেক স্ত্রী অকালে বিধবা হয়—অনেক সংসার ভেঙে যায়। বহু মহিলা তখন স্বামী, পুত্র, বাড়ি-ঘর হারা হয়ে নতুন স্বামী ও আশ্রয়ের সন্ধান করছিল।

তৎকালীন ফ্রান্সের পারিবারিক জীবনের এই ঘোর বিপর্যয়ের

পূর্ণ সুযোগ নিল মধ্য বয়সী, বুদ্ধিমান সুদর্শন হেনরী। সে তার নির্জন ভিলা—ইরমিটেজে এক অভিনব প্রেমের ব্যবসা খুলে বসলো। প্যারিসের খবরের কাগজে সে 'পাত্রী চাই' বলে চিত্তাকর্ষক এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলো—এক সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, ধনী, শিক্ষিত ও বিপত্নীক পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। উপযুক্ত বিবেচিত হলে, পাত্রী বিধবা এমন কি এক সন্তানের জননী হলেও আপত্তি নেই। বিবাহ প্রার্থীদের সাক্ষাতের সময় ও স্থান প্রার্থীদের দরখাস্ত পেলে তাদের ঠিকানায় জানিয়ে দেওয়া হবে।

ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত ফ্রান্সে তখন বিধবা ও অবিবাহিত স্ত্রীলোকের ছড়াছড়ি—অথচ বিবাহযোগ্য পুরুষের অত্যন্ত অভাব। যুদ্ধের কারণে তখন নিরাপত্তার জন্য শহর ছেড়ে বহু মহিলা তাদের আসবাবপত্র বিক্রি করে গ্রামে চলে যেতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। সুচতুর হেনরী বিবাহের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে 'আসবাবপত্র বিক্রি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের' কাছ থেকেও সে আবেদনপত্র আহ্বান করলো। হেনরীর এই উভয় বিজ্ঞাপনে প্রচুর সাড়া মিললো। বিশেষভাবে মহিলাদের তরফ থেকে বহু আবেদনপত্র তার হস্তগত হলো।

এই সুযোগে হেনরী শতাধিক মহিলার সংস্পর্শে এসেছিল। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা যে, এদের প্রায় প্রতিটি মহিলাকে সে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গভীর প্রেমে মজিয়ে তুলতে পেরেছিল—যদিও তখন তার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। কী যে এক অজ্ঞাত মোহ ও আকর্ষণী শক্তি ছিল তার মধ্যে, যার টানে সে ঐ বয়সেও শত শত মহিলাকে প্রেমে হাবুডুবু খাওয়াতে সক্ষম হয়েছিল দু'একবার দেখা সাক্ষাতের পরেই।

প্রথম দিকে তার লক্ষ্য ছিলো ঐ প্রেমে পাগল মহিলাদের ভুলিয়ে নিয়ে তাদের দেহ ভোগ ও অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করা। কিন্তু শিগগিরই সে টের পেল যে এভাবে এগোলে অচিরেই তার ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। তাই হেনরী এবার তার কৌশল বদলালো।

নারীদের মন ভোলানোর কোনো যাদুমন্ত্র তার জানা ছিল কিনা বলা যায় না,তবে প্রেমের ক্ষেত্রে তার অসামান্য সাফল্য বিশ্বের ইতিহাসে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে যেসব মহিলা তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসতো তারা হেনরীর সঙ্গে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সাক্ষাতেই ভয়ানক ভাবে তার প্রেমে মজে যেতো। হেনরীও সেই সুযোগে তাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসতো। বলা বাহুল্য, ঐ মহিলারাও সরল বিশ্বাসে ওর আহ্বানে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিতো।

পরবর্তীকালে হেনরীর ডায়েরী থেকে ও বিচারের সময় সাক্ষ্য প্রমাণে জানা যায় যে, কোনো কোনো সময় হেনরী একই সময় সাত জন মহিলার সঙ্গে গভীর প্রেম চালিয়ে যাচ্ছিল আর সেই সঙ্গে সে আরও ডজনখানেক মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো তার যৌন আবেগপূর্ণ প্রেমপত্রের মাধ্যমে। এদের প্রায় প্রত্যেকটি মহিলাকে সে তখন বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, সেই হেনরীর একমাত্র প্রেমাস্পদ। পরবর্তী কালে হেনরীর গ্রেফতারের পরপরই পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে আরও অনেক আলামতের সঙ্গে তার ভিলা ইরমিটেজ থেকে উদ্ধার করে এক বাণ্ডিল কামোদ্দীপক প্রেমপত্র, যেগুলো ২/১ দিনের মধ্যেই ডাকে পাঠাবার জন্য তৈরি ছিল।

আবার ঠিক একই সময় হেনরী একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও দায়ি-

Mamun Academy

স্বশীল স্বামী ও পিতা হিসেবে তার স্ত্রী ও পুত্রকে আলাদা বাসায় রেখে দেখাশুনা করে আসছিল। তারা কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করার কোনো অবকাশই পায়নি যে, হেনরী তার ব্যবসায় ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল ঐ ভিলাতে যাতায়াত করতো। ওরা অবশ্য হেনরীর ব্যবসায়ের ধরন সম্পর্কে কিছুই জানতো না। এমন কি তারা কয়েকবার নিজেদের অজান্তে হেনরীর হত্যা করা মহিলা-দের জিনিসপত্র অন্যত্র বিক্রি করতে তাকে সাহায্য করেছিল।

হেনরীর জীবনের প্রথম শিকার ছিল এক মধ্যবয়স্কা বিধবা মহিলা। নাম—'চুটেট'। সে হেনরীর 'পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গে পরিচিত হয়। মাত্র কয়েকদিনের 'ঝটিকা প্রেমের' পরই সেই মহিলা বিশ্বাস করে বসে যে হেনরী তাকেই বিয়ে করবে। তারপরই ম্যাডাম চুটেট হেনরীর সঙ্গে তার ভিলা-ইরমি-টেজে বসবাস করতে আসে। সঙ্গে সে তার ১৭ বৎসর বয়স্ক পুত্রকেও নিয়ে আসে। ব্যাস, সেদিনই মা ও পুত্র উভয়কেই পৃথিবী থেকে চিরদিনের মতো বিদায় নিতে হয়। আর সুকৌশলে ঐ কাজ সমাধা করে হেনরী পরদিন তার ছোট্ট নোট বইতে সাংকেতিক ভাষায় লিখে রাখলো—'ভার্ণাউলেট এর পথে ফিরতি ভ্রমণের জন্য দুইটি সিঙ্গল টিকিট কেনা হলো'। ম্যাডাম চুটেট ও তার ছেলের নামও নোট বইয়ের একপাশে লিখে রাখলো সে। এর কিছুদিন পরেই হেনরীর স্ত্রীর ঘরে ম্যাডাম চুটেট-এর কিছু জিনিসপত্র এসে উঠলো। আর সেই সঙ্গে হেনরীর পুত্রের প্রেয়সীর অঙ্গে শোভা পেল মৃত ম্যাডামের কয়েকটি দামী গহনা। এমন কি কয়েক বৎসর পরে যখন পুলিশ হেনরীকে খুনের দায়ে গ্রেফতার করে, তখনও কিন্তু তার পুত্রের বান্ধবীর অঙ্গে চুটেটের সেই গহনাগুলো শোভা পাচ্ছিল।

Mamun Academy

হেনরীর গ্রেফতারের কাহিনীও বেশ অভিনব।

১৯১৪ সাল থেকে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবত হেনরীর প্রেমিকারা মাঝে মাঝে রহস্যজনক ভাবে হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাচ্ছিল। তাদের আত্মীয়স্বজনেরা যথাসময়ে পুলিশের কাছে ঐ নিরুদ্দেশ মহিলাদের সম্বন্ধে রিপোর্ট দিচ্ছিল। পুলিশ তদন্ত চালিয়ে দেখতে পায় যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের অন্তর্ধানের কারণ ও পরিবেশ ছিল ভিন্ন ভিন্ন, এমন কি ঐ মহিলাদের অজ্ঞাত প্রেমিকদের নাম এবং ঠিকানাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ চতুর হেনরী বিভিন্ন ভাবে তার ভিন্ন ভিন্ন প্রেমিকদের আকর্ষণ করছিল। আর প্রতিটি বিজ্ঞাপনে সে নতুন নতুন নাম ঠিকানা ব্যবহার করেছিল। তাই পুলিশ বিভিন্ন সময় ঐ মহিলাদের উধাও হওয়ার কারণ সম্পর্কে একই ব্যক্তিকে সন্দেহ করার কোনো সূত্রই খুঁজে পায়নি।

ঘটনাক্রমে ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে প্যারিসের এক রাস্তায় হেনরীকে দেখতে পায় এক তরুণী। সে জানতো যে তার নিখোঁজ বোনের প্রেমিক ছিল ঐ হেনরী। বোন নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে সে হেনরীকে খুঁজছিল, কিন্তু এতদিন তার দেখা পায়নি। গোপনে সেই তরুণী হেনরীকে অনুসরণ করে তার বাসা চিনে নিল। তারপর সে পুলিশকে খবর দিল।

পুলিশ দ্রুত এসে যখন হেনরীকে ঐ বাসা থেকে গ্রেফতার করলো তখনো কিন্তু তারা টের পায়নি যে ফ্রান্সের অপরাধের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান আসামীকেই তারা সেদিন ধরতে পেরেছে।

পুলিশ যখন হেনরীকে ধরে থানার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সাদা পোশাক পরিধেয় একজন ডিটেকটিভও তাদের পিছু পিছু এসেছিল। হঠাৎ সেই ডিটেকটিভ লক্ষ্য করলো যে আসামী হেনরী

Mamun Academy

তার কোটের পকেট থেকে সন্দেহজনকভাবে একটি ছোট্ট 'নোট বই' পুলিশের অজান্তে বের করে রাস্তার পাশের এক ঝোপের মধ্যে ফেলে দিল। ডিটেকটিভ ঐ নোট বইটি তুলে নিল। দেখা গেল তাতে আছে সাংকেতিক ভাষায় কতগুলি লেখা। নিজ হাতে লেখা ঐ ছোট্ট নোট বইটিই শেষ পর্যন্ত হেনরীর কাল হলো। নোট বইয়ের ঐসব সাংকেতিক ভাষার সূত্র ধরেই সকল গোপন তথ্য পুলিশের কাছে আস্তে আস্তে ফাঁস হতে শুরু করলো। আর তখনই কেবল জানা গেল যে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবত কমপক্ষে এগারটি রহস্যজনক হত্যা-কাণ্ডের মূলে ছিল ঐ নরপিশাচ হেনরী।

এই চাঞ্চল্যকর মামলার বিচারের সময় ঐ ছোট্ট নোট বইটিই হেনরীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রমাণের প্রধান সাক্ষী হয়ে দাঁড়ালো। আপাতদৃষ্টিতে কিন্তু নোট বইটির লেখাগুলি দেখে মনে হতো এগুলি কোনো ব্যবসার হিসেবের নোট বই। কিন্তু এর প্রথম রহস্য ভেদ হলো যখন পুলিশ ওর ভেতরের দিকে এক জায়গায় দেখতে পেল কতগুলি মহিলার নাম লেখা আছে। ঐ নামগুলি মিলিয়ে দেখা গেল যে ১৯১৫ সাল থেকে যে দশজন মহিলা বিভিন্ন সময়ে রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই নাম লিপি-বদ্ধ আছে নোট বইয়ের ঐ পৃষ্ঠা কয়টিতে—অবশ্য হেঁয়ালিপূর্ণ ভাবেই লেখা ছিল ঐ নামগুলি।

এর সূত্র ধরেই পুলিশ জোর তদন্ত শুরু করে দেখতে পেলো যে হেনরী ঐ পাঁচ বৎসরে প্যারিস শহরের এগারটি স্থানে বিভিন্ন সময়ে বাস করেছে। আর ঐ সময়ের মধ্যে সে ১৫টি ছদ্মনাম ধারণ করেছে। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে সে তার পূর্ববর্তী শিকার নিহত মহিলার নাম-ও ধারণ করেছে।

Mamun Academy

১৯২১ সালে হেনরীর অবিস্মরণীয় বিচার শুরু হলো ফ্রান্সের বার্গেরিন কোর্টে। সমগ্র প্যারিস যেন ভেঙে পড়লো কোর্টে ঐ বিচার দেখতে। বিচারের সময় বরাবরই কিন্তু আসামী হেনরী একটি আভিজাত্য বজায় রেখেছিল। অন্য সব খুনী আসামীদের চেয়ে সে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

একই সময় ভিন্ন ভিন্ন মেয়েদের সঙ্গে সে কিভাবে প্রেম করেছিল সে-সম্বন্ধে তাকে প্রশ্ন করা হলে আসামী মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল—'সে-সব ছিল ভালবাসার ব্যাপার। আমি একজনকে চুমু খেয়ে সে-সম্বন্ধে সবাইকে বলে বেড়াতে পারি না নিশ্চয়ই।'

বিচার চলাকালীন একদিন হেনরী হঠাৎ জজ সাহেবকে খবর পাঠালো যে সে খুবই অনুতপ্ত বোধ করছে, তাই জজ সাহেবের কাছে সব কথা খুলে বলতে চায়। পুলিশ এই খবর পেয়ে মহাখুশি—তাহলে শেষ পর্যন্ত হেনরী তার অপরাধের স্বীকারোক্তি করতে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে পুলিশের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। কারণ ঐসব হত্যাকাহিনীর কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষী না থাকায় এতদিন কেবলমাত্র ঘটনা পরম্পরার সাক্ষীর ওপরই পুলিশকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হচ্ছিল, যে কারণে এই মামলায় আসামীর দোষ প্রমাণ খুব দুরুহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আসামীর স্বীকারোক্তি পাওয়া গেলে এসব অসুবিধা সহজেই দূর হয়ে যায়।

যথাসময়ে বিচারকের সামনে হাজির করা হলে, আসামী হেনরী এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বলে চললো— 'আমি অকপটে আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমি সত্যিই ভয়ানক অনুতপ্ত। এ পর্যন্ত আমি ২৮৩ জন মহিলার সঙ্গে গভীর প্রেমে লিপ্ত হয়ে আমার স্ত্রী, যাকে আমি সত্যিই ভালবাসি, তার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা

করেছি।' আসামীর মুখে ২৮৩ জন মহিলার সঙ্গে প্রেমের কথা শুনে সমস্ত কোর্টরুম মৃদু হাসি ও গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠলো।

বিচারকার্য যতই এগোতে লাগলো, ততই সরকারপক্ষের বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণে আসামী কর্তৃক বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে প্রেমের ও তাদের অনেককে খুনের বীভৎস কাহিনী একে একে উদঘাটিত হতে শুরু করলো। আসামীর প্রথম শিকার ছিল ম্যাডাম চুটেট ও তার পুত্র—যে কাহিনী আগেই বলা হয়েছে। আসামীর লেখা তার নোট বই-এর সাংকেতিক ভাষায় লেখা ছিল 'ভার্নাউলেটের পথে প্রথম দু'টি সিঙ্গল টিকিট'।

ঐ একই নোট বইয়ের পরবর্তী পাঁচ বৎসর ধরে একে একে হত্যা করা সমস্ত মহিলার কথা সংক্ষেপে সাংকেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল। এই হতভাগ্য মহিলাদের অধিকাংশই ছিল বিধবা অথবা স্বামী পরিত্যক্তা। তবে এদের মধ্যে একজন ১৯ বৎসর বয়স্কা যুবতীও ছিল।

হেনরী তার প্রণয়ীদের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা ঠিক করে তাদের হাতে পাঠিয়ে দিত একটি দামী 'এনগেজমেন্ট রিং', (যাকে বিচার চলাকালীন বাদী পক্ষের উকিল নাম দিয়েছিল 'ডেথ রিং বা মরণ আংটি) বিচারের সময়ও সেই এনগেজমেন্ট রিংটি ছিল হেনরীর শেষ প্রেয়সী মিলি মেগারেট নামের এক সুন্দরীর আঙুলে। ঐ একই আংটি হেনরী পরিয়েছিল তার পূর্বের শিকার দশজন প্রেয়সীকে। বিচারের সময় এ-ও প্রকাশ পেল যে, মিলি মেগারেটের সঙ্গে গভীর প্রেমে নিমগ্ন থাকার সময়ও হেনরী জেনী-ফলকু নামের অন্য একজন মহিলার সঙ্গে প্রেমলীলা চালিয়ে যাচ্ছিল। এর কাছ থেকে হেনরী দু'হাজার ফ্রাঙ্কও ধার করেছিল। 'ডেথ রিং' পরিহিতা মিলি মেগারেট জানতো যে, শেষ পর্যন্ত সে অল্পের জন্য হেনরীর

Manna Academy

নিশ্চিত মরণ ফাঁদ থেকে বেঁচে গেছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে তবুও সে কোর্টে হেনরীর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় সাক্ষী দিতে রাজি হয়নি। বরং সে-সময়ও মিলি বলতো,—'হেনরী আমার প্রতি সবসময় অন্তরঙ্গ ও সম্মানজনক ব্যবহার করেছে, আমি তার প্রেমে কোনো কৃত্রিমতা দেখিনি। আমি তাকে সত্যিই ভালবাসতাম, এমন কি বিয়েও করতাম।'

কোর্টের আদেশে বাধ্য হয়ে বিচারে সাক্ষ্য দিতে উঠে মিলি কখনো হেনরীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত সে যখন সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে আসামী হেনরীর মুখের দিকে তাকাতে বাধ্য হলো, তখন মিলি হেনরীর কাতর চাহনি সহ্য করতে না পেরে কাঠগড়াতেই মূর্ছিত হয়ে পড়লো।

হেনরীর বিরুদ্ধে তার খুনের প্রমাণ হিসেবে বাদীপক্ষ থেকে কোর্টে ২৫৬ টুকরা আধ পোড়া মানুষের হাড় এনে হাজির করা হয়। এগুলো হেনরীর ভিলার চুল্লীর ছাই-এর গাদার ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেছে যে এগুলি সবই মানুষের হাড়, আর সেখানে কমপক্ষে তিনজন মহিলার কঙ্কালের অংশ ছিল।

অন্য একজন বিশেষজ্ঞ ভিলা ইরমিটেজের চুল্লীর চিমনিতে লেগে থাকা কালি ও ঝুল পরীক্ষা করে দেখতে পায় যে সেগুলো ছিল অস্বাভাবিক রকম চর্বিযুক্ত, যা থেকে বোঝা যায়, ঐ চুল্লীতে মানুষের বা অনুরূপ চর্বিযুক্ত বহু দেহ পোড়ানো হয়েছে। ঐ একই বাড়িতে অন্য একটি ছাই-এর গাদার মধ্যে মেয়েদের অন্তর্বাসের টুকরো, লুপ ও আধপোড়া বোতামের অংশ পাওয়া গেছে। ঐ ভিলায় জিনিস রাখবার একটি ছোট্ট ঘরে অনেকগুলো বোতল পাওয়া গেল যাতে ভর্তি ছিল মানুষের শিরা-উপশিরা ধ্বংস করবার একপ্রকার

Mamun Academy

তরল এসিড। এগুলো সবই বিচারের সময় আলামত হিসেবে কোর্টে উপস্থিত করা হয়।

ঐ ভিলার আশেপাশের বহু লোক সাক্ষ্য দিতে এসে বলেছে যে বাড়িটি তাদের সবার কাছেই এক রহস্যপুরীর মতো ছিল। আর ঐ বাড়ির চিমনি থেকে মাঝে মাঝে খুব দুর্গন্ধযুক্ত ধোঁয়া বেরুতো।

এসব সাক্ষ্য প্রমাণে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, হেনরী 'ভিলা-ইরমিটেজে' বিভিন্ন সময় তার পানিপ্রার্থীদের নিয়ে এসে সেখানেই কমপক্ষে দশজন মহিলা ও একজন যুবককে হত্যা করে তাদের লাশ চিমনিতে পুড়িয়ে ফেলে তা গুম করার চেষ্টা করেছে।

মনোবিজ্ঞানী ও ডাক্তারেরা যাঁরাই হেনরীকে পরীক্ষা করেছেন, তাঁরাই আশ্চর্য হয়ে গেছেন এই দেখে যে তার মধ্যে এমন এক মোহিনী শক্তি ছিল যার বলে ৫০ বছর বয়সেও সে শত শত মহিলাকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। আরও বিচিত্র যে, মাত্র ২/৩ দিনের পরিচয়ের পরই তারা সবাই স্বেচ্ছায় হেনরীকে দেহ-মন সবই দান করেছিল। তবে এটা সবাই স্বীকার করেছে যে হেনরীর বৈশিষ্ট্য ছিল তার চোখ ও সুন্দর কালো দাড়িতে। ওর চোখ জোড়া ছিল উজ্জ্বল, আর তাতে ছিল এক আশ্চর্য আকর্ষণ। মাথায় চুল কম থাকলেও সুন্দর ভাবে ছাঁটা ছিল। তবে হেনরী বিশেষভাবে গর্বিত ছিল তার ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ির জন্য। প্রতিটি মেয়ে যারা তার সংসর্গে এসেছে তারা ওর দাড়ি ও চোখের প্রশংসা করেছে অজস্রবার। এমন কি এই মামলা চলার সময় প্যারিসের যুবকদের মধ্যে মেয়েদের মন জয় করার অস্ত্র হিসাবে হেনরীর দেখাদেখি দাড়ি রাখা এক ফ্যাশান হয়ে দাঁড়ায়। তারা এর নাম দিয়েছিল 'হেনরী কাট' দাড়ি।

Mamun Academy

'কিভাবে সে এত মহিলার মন জয় করলো ?' এ প্রশ্ন করা হলে হেনরী রহস্যময় হাসি হেসে উত্তর দেয়—প্রথম দিকে আমাদের মধ্যে ছিল প্রধানত ব্যবসার সম্পর্ক। তারপর ব্যক্তিগত যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা ছিল আমার ও তাদের মধ্যেকার এক ব্যক্তিগত ব্যাপার যা অনুকরণ করা যায় না বা ভাষায়ও বুঝিয়ে প্রকাশ করা যায় না।

বিচারে হেনরীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হলো। বিচারক আদেশ দিলেন—১৯২২ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী খুব ভোরে ভার্সাই জেলে হেনরীর শির দ্বিখণ্ডিত করা হবে গিলোটিনের নিচে।

তার গিলোটিনের কাহিনীও জানা যায় প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক মিঃ ওয়েব মিলারের বিবরণে :—

"নির্দিষ্ট দিনে ঠিক ভোর চারটায় খবর পাওয়া গেল যে ভার্সাই জেলের বিখ্যাত জল্লাদ আনাতোলে দেইবলার তার গিলোটিন নিয়ে ইতিমধ্যেই জেলে পৌঁছে গেছে। এই খবর পেয়েই আমরা দৌড়ালাম জেলের দিকে। অবশ্য এর আগে থেকেই উত্তেজনায় বলতে গেলে আমার সারারাত ঘুম হয়নি।

জেলের কাছে পৌঁছে দেখি চারশত সৈন্য আগেই সেখানে এসে এলাকাটি ঘিরে ফেলেছে ও প্রবেশের ছটি পথই আটকে দিয়েছে। যাদের কেবলমাত্র বৈধ পাস ছিল তাদেরই যথাযথ পরীক্ষার পর ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। আমি গেটে আমার পাস দেখিয়ে ভেতরে ঢোকার অনুমতি পেলাম। দেখলাম, ভেতরে কোনো আলো নেই। কেবল রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোতে স্থানটি মৃদু আলোকিত হয়েছে। ভেতরে গিয়ে দেখা গেল সেখানে প্রাচীন যুগের লণ্ঠন হাতে নিয়ে কয়েকজন লোক চকচকে গিলোটিনের বিশাল ভারি ব্লেডটি নাট-

বল্টুর সাহায্যে সাবধানে যথাস্থানে আটকে দিচ্ছে। গিলোটিনের চারপাশ ঘিরে প্রায় একশো কর্মচারী ও সাংবাদিক দাঁড়িয়ে আছে।

আমি যতদূর সম্ভব বধ্যভূমির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার অবস্থান থেকে গিলোটিনটি মাত্র ১৫ ফুট দূরে ছিল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম পরবর্তী দৃশ্যের জন্য। জেলের অভ্যন্তর থেকে খবর পাওয়া গেল হেনরী ল্যাণ্ড্রুর সেই বিখ্যাত সুন্দর কালো দাড়ি আগেই কেটে ফেলা হয়েছে। হেনরী তাকে পরিষ্কার ভাবে শেভ করিয়ে দিতে বলেছে কারণ এতে নাকি তার মতে দর্শনার্থী মেয়েরা তাকে দেখে খুশি হবে। তার শার্টের কলারের নিচ থেকে কেটে ফেলে সমগ্র গ্রীবাদেশ আবরণহীন করে ফেলা হয়েছে। তার পরিধানে ছিল একটি সস্তা কালো প্যান্ট। পায়ে মোজা ছিল না।

সেই হিমেল ভোরে উষার আলোর সাথে সাথে ঘোড়ায় টানা একটি বড় গাড়ি এসে থামলো। গাড়িটিকে টেনে একেবারে গিলোটিনের কাছে নিয়ে আসা হলো।

জল্লাদ দেইবলারের সহকারী দুজন এগিয়ে এসে শকটের দরজা খুলে তার ভেতর থেকে দুটি খালি বাক্স টেনে বের করে আনলো। গোলাকার ছোট বাক্সটি গিলোটিন যন্ত্রের সামনের দিকে বসিয়ে দিল, যাতে গিলোটিনের পর দ্বিখণ্ডিত মুণ্ডুটি ওতে গিয়ে পড়তে পারে। আর কফিনের মতো দেখতে বড় বাক্সটি রাখা হলো গিলোটিনের পেছনের দিকে।

এরপরই হঠাৎ জেলের ভেতরের দিকের বড় গেটটি খুলে গেল। উৎসুক দৃষ্টিতে ওদিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনজন মানুষ দ্রুত হেঁটে এগিয়ে আসছে ঐ গেট দিয়ে। আসামী হেনরী ছিল

Mamun Academy

মাঝখানে, আর তার দুপাশে ছিল দুজন জেলার। তারা হেনরীর বাহু ধরে তাকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছিল। হেনরীর দু'হাত পেছনের দিকে পিঠমোড়া করে বাঁধা, তার পা ছিল নগ্ন। ঠাণ্ডা পাথরের মেঝের ওপর দিয়ে এগুতে তার পা যেন সরছিল না। তার হাঁটু দুটো কাঁপছিল, কিন্তু এগুচ্ছিল না। জেলার দুজন দুপাশ থেকে তাকে প্রায় শূন্যে তুলে টেনে নিয়ে আসছিল দ্রুতগতিতে। হেনরীর দিকে চেয়ে দেখি তার মুখ একেবারে মোমের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আর মুখে কালিমা পড়ে গেছে, বোধ হয় আসন্ন নিশ্চিত মৃত্যুর চিন্তায়।

হেনরীকে মুহূর্তের মধ্যে টেনে এনে তাকে উপুড় করে মুখ মাটির দিকে রেখে একেবারে গিলোটিনের নিচে শুইয়ে দেয়া হলো। তার আবরণহীন গলা এসে পড়লো অর্ধ চন্দ্রাকৃতি একটি শক্ত কাঠের ওপর, যার ঠিক ওপরে ঝুলছিল বিশাল চকচকে ভারি গিলোটিনের ধারালো ব্লেডটি। হেনরীর গলা কাঠের উপর ঠিক ভাবে বসানো মাত্রই জল্লাদ একটি রশি টান দিল, সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে গিলোটিনের ঝুলন্ত ধারালো ব্লেডটি নেমে এসে এক ঘায়ে হেনরীর ধড় থেকে মাথা একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো।

এরপরেই একজন লোক কাঠের বেদীটি একপাশে একটু উঁচু করে ধরলো, আর সঙ্গে সঙ্গে হেনরীর বিচ্ছিন্ন মুণ্ডুটি গড়িয়ে এসে সামনের গোল বাক্সটির ভেতরে গিয়ে পড়লো। আর একজন তড়িৎ-গতিতে এগিয়ে এসে তা তুলে নিয়ে একটি রঙিন কাগজে কপির মতো মুড়ে নিয়ে অন্য একটি বড় বাক্সের মধ্যে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাক্সটি তুলে নিয়ে যাওয়া হলো কাছাকাছি রাখা একটি বড় গাড়িতে।

Maman Academy

হেনরীর মুণ্ডহীন ধড়টিও অনুরূপ ভাবে গড়িয়ে পড়লো পেছনের দিকে রাখা বড় বাক্সটির মধ্যে। সে-সময় ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছিল সামনের দিকে। এই বীভৎস দৃশ্য দেখে ওখানে উপস্থিত প্রায় সকলেই আতঙ্কে শিউরে উঠলো। ওর ধড়টিকে বড় বাক্সের ভেতরে পুরে ঐ একই গাড়িতে তোলা হলো। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই সাথে ঘোড়ার পিঠে সহিস জোরে চাবুক কষলো। দেখতে দেখতে গাড়ি নিয়ে ঘোড়া ছুটো দ্রুত উধাও হয়ে গেল।

এবার আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে হেনরী ল্যাণ্ড্রু-কে জেলের গেট দিয়ে ঢোকাবার পর থেকে উপরে বর্ণিত সমস্ত ঘটনা ঘটতে মাত্র ছাব্বিশ (২৬) সেকেণ্ড সময় লেগেছিল।'

Manna Academy

স্মাগলার !

পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে উপরে উঠতেই যা কষ্ট। কিন্তু একবার উঠে কোর্ট বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে চারদিকে দৃষ্টি মেললে সামনে যে অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য ভেসে ওঠে, তাতে নিমেষে সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। প্রশংসা করতে হয় ইংরেজদের সৌন্দর্যজ্ঞানের। শতাধিক বছর আগে চট্টগ্রামের ঐ মনোরম পরিবেশে তাদের তৈরি কোর্ট বিল্ডিংটি পর্যটকদের জন্য এ শহরে আজও এক বিশিষ্ট দর্শনীয় বস্তু হয়ে আছে।

অল্প ক'দিন আগে বদলি হয়ে চট্টগ্রাম জজ কোর্টে যোগদান করেছি। কোর্ট বিল্ডিংয়ে অবস্থিত আমার এজলাসটি বড়ই ভালো লাগতো। সুবৃহৎ ঐ কোর্টরুমের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে প্রশস্ত জানালা। সেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই দেখা যেতো অদূরে ছবির মতো এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে কর্ণফুলী নদী, নদীর ওপারে সবুজ অনুচ্চ পাহাড়ের সারি। আবার আকাশ পরিষ্কার থাকলে দক্ষিণের জানালা দিয়ে কর্ণফুলী পেরিয়ে দেখা যেতো বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলরাশি, আর কর্ণফুলীর মোহনায় ভিড়ে থাকা সমুদ্রগামী জাহাজগুলি। হু হু করে সমুদ্রের মুক্ত হাওয়া আছড়ে পড়তো আমার সমস্ত ঘরটিতে। এই সুন্দর পরিবেশে সারাদিন প্রচণ্ড কাজের ভিড়েও একবার শুধু জানালা দিয়ে বাইরে কিছুক্ষণ তাকালেই সব ক্লান্তি

পুর হয়ে যেতো।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে একদিন কোর্টে কাজ জমে ছিল প্রচুর। সারাদিন ধরে একগাদা কেসের শুনানীর পর বিকেলের দিকে পেশকার বিনীতভাবে বললো, 'স্যার,আজ আর কোনো কাজ বাকি নেই।' শুনে মনটা নেচে উঠলো—ভাবলাম আজ তাহলে একটু বেলা থাকতেই টেনিস মাঠে যাওয়া যাবে, সেখানে খেলা জমবে ভালো।

এজলাস ছেড়ে উঠতে যাবো ঠিক এমন সময় একটি ক্ষীণকণ্ঠ ভেসে এলো আসামীর কাঠগড়া থেকে—'হুজুর আমার কি হবে—আমি যে আর পারছি না।'

চমকে উঠে কাঠগড়ার দিকে তাকিয়ে দেখি ২০/২২ বৎসরের এক শীর্ণকায় যুবক দুহাত জোড় করে আমার দিকে চেয়ে কাতর কণ্ঠে মিনতি করে বলছে ঐ কথাগুলো। আরো লক্ষ্য করলাম,ওর ঐ ধৃষ্টতার জন্য আমার পেশকার রক্তচক্ষু মেলে ওর দিকে তাকাচ্ছে।

আবার বসে পড়লাম বিচারকের চেয়ারে।

কড়া সুরে পেশকারকে জিজ্ঞেস করলাম—'ওর কি কেস আছে আজ? রেকর্ডটি দেননি কেন এতক্ষণ?'

পেশকার কাঁচুমাচু হয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বললো—'স্যার, ওর কেসে কোনো পক্ষেরই উকিল নেই। সরকার পক্ষের কোনো সাক্ষীও নেই। তাই এ কেস আজ হবে না দেখে আর একটি দিন দিয়ে দিতে চাইছি।' মাথা নেড়ে হাত বাড়াতেই পেশকার ওর কেস রেকর্ডটি আমার দিকে এগিয়ে দিল।

রেকর্ডটি হাতে নিয়ে আসামীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই সে জড়িত কণ্ঠে ওর স্থানীয় ভাষায় কি যেন বলে চললো যার অধিকাংশই আমার বোধগম্য হলো না। এবার ওর কেস রেকর্ডটির

Mamun Academy

পাতা ওল্টাতে শুরু করলাম। এজাহারে চোখ বুলিয়ে থমকে গেলাম —মাত্র ৩১ টাকা ৪০ পয়সার ওষুধ পাচারের অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ছয় মাস আগে। আসামী একজন বার্মার আরাকানী মুসলিম যুবক। স্থানীয় ভাষায় ওদের বলা হয় 'রোহিঙ্গা'। চট্টগ্রাম ও বার্মার এক মিশ্রিত ভাষায় ওরা কথা বলে যা সহজে বোঝার সাধ্য আমার নেই।

ভাগ্যক্রমে তখন কোর্টে উপস্থিত ছিলেন ঐ অঞ্চলের একজন নেতাগোছের উকিল। তাঁকে অনুরোধ করতেই তিনি এগিয়ে এলেন আমাদের সাহায্যে। আসামীর বক্তব্য তিনি শুনতে লাগলেন। আমিও এই ফাঁকে কেস রেকর্ডটি দেখতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর উকিল সাহেব এগিয়ে এসে বললেন— 'স্যার, এই আসামীর কাহিনী বড় করুণ। মাত্র ৩১ টাকা ৪০ পয়সার ওষুধ সহ ওকে ছয় মাস আগে চোরাচালানীর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। সেই থেকে সে হাজতে আছে। আসামী তার দোষ স্বীকার করতে চায়। কেস্ রেকর্ডও উল্টে দেখলাম, সত্যিই ওর বিরুদ্ধে মাত্র ৩১ টাকা ৪০ পয়সার ওষুধ স্মাগলিঙের অভিযোগ। আর বিদেশী এই নাগরিক সেই অভিযোগে গত ছয় মাস যাবত হাজতে আছে। প্রতি মাসেই রুটিন মাফিক তাকে কোর্টে হাজির করা হয়, কিন্তু সরকার বা আসামী পক্ষের কোন উকিল উপস্থিত না থাকায় প্রতিবারই কেসের দিন পিছিয়ে যায়। আসামীও আবার নীরবে ফিরে যায় জেল হাজতে। এমন কি এই ছ'মাসের মধ্যে আসামীর পক্ষ থেকে কোর্টে কোনো জামিনের আবেদনও করা হয়নি। আসামীর সঙ্গে আরো কথা বলে উকিল সাহেব জানালেন, এদেশে ওর কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। সে বার্মার নাগরিক। কোর্টের কাছে তার আবেদন

Mamun Academy

—আজই যেন তার বিচার করে তাকে যে শাস্তি হয় দিয়ে দিই। দেশে সে তার পিতাকে মরণাপন্ন অবস্থায় রেখে এসেছে, হয়তো এতদিন সে আর বেঁচে নেই।

ঠিক করলাম, আজ এর বিচার শেষ না করে উঠবো না তাতে রাত যতই হোক। সরকারী উকিলকে ডেকে আনা হলো। দেখলাম সেদিনও এই কেস করার তাঁর মোটেই ইচ্ছা নেই। আমি তখন তাঁকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম যে এই সামান্য কেসে আসামী যখন দোষ স্বীকার করছে তখন আজই এর বিচার সমাধা করতে হবে। এই কেসে আসামীকে আর হাজতে পাঠানো যাবে না। আমার অনুরোধ, বিনা পয়সায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করতে রোহিঙ্গা ভাষা জানা ঐ উকিল সাহেবও এগিয়ে এলেন সেদিন।

আসামীর স্বীকারোক্তি ও কেস রেকর্ডে এই মামলার যে কাহিনী প্রকাশ পেল, তা সত্যিই হৃদয়বিদারক।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে নাফ নদীর তীরে অবস্থিত ছোট্ট সুন্দর শহর 'টেকনাফ'। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি নাফ নদী এখানে বয়ে চলেছে বার্মা ও বাংলাদেশের সীমানার মধ্য দিয়ে। ওপারের বার্মার আরাকান প্রদেশের অধিবাসী আসামী মোহাম্মদ হানিফ একজন রোহিঙ্গা মুসলিম। খুবই অনগ্রসর বার্মার এই অঞ্চল। স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে। কৃষিই ওদের একমাত্র অবলম্বন। এর উপর আছে নিষ্ঠুর মগদের অত্যাচার। বিপদে আপদে নাফ নদী পেরিয়ে এপারে বাংলাদেশে ওদের আনাগোনাই বেশি। ওদের ওখানে বিদেশী ওষুধপত্র সহ অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায় না। জরুরী অবস্থায় এসব সংগ্রহের জন্য তাদের আসতে হয় নিকটবর্তী বাংলাদেশের টেকনাফ বাজারে।

Mamun Academy

ছ'মাস আগের কথা। হানিফের বাবা ভয়ানক অসুস্থ। সেই তার পিতামাতার বড় ছেলে। ওদের বাড়ির কাছাকাছি ভালো ডাক্তার নেই। হাতুড়ে ডাক্তার যারা আছে তাদের দেখিয়ে কোনো ফল হলো না। বাবাকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টায় তারা বহু টাকা খরচ করে শহর থেকে এক পাস করা ডাক্তার নিয়ে এলো। ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষার পর ইংরেজীতে একটি প্রেসক্রিপশন দিয়ে বললেন, এই ওষুধ শিগগির কিনে এনে রোগীকে দিতে হবে, তাহলে তার প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মুশকিল হলো, কাছাকাছি কোনো বড় ওষুধের দোকান নেই। আশেপাশের ছোট দোকানগুলোতে খোঁজ করে ঐ ওষুধ পাওয়া গেল না। দোকানদার বললো, ঐ ওষুধ পেতে হলে রেঙ্গুন অথবা টেকনাফ যেতে হবে। ওখান থেকে রেঙ্গুন গিয়ে তিন দিনেও ফেরা সম্ভব নয়। তাই নিরুপায় হানিফ সেদিনই কিছু সুপারী নিয়ে নদী পার হয়ে চলে আসে টেকনাফে। এখানে ঐ সুপারী বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে ওষুধ কয়টি কিনে নেয় টেকনাফের একটি ওষুধের দোকান থেকে। মোট দাম পড়ে ৩১ টাকা ৪০ পয়সা। (কেস রেকর্ডের সঙ্গে আসামীর কাছ থেকে সীজ করা ওষুধের সঙ্গে ঐ প্রেসক্রিপশনের ৩১ টাকা ৪০ পয়সার ক্যাশ মেমোটিও গাঁথা আছে)। ওষুধ নিয়ে সন্ধ্যার দিকে সে একটি নৌকায় নদী পার হয়ে ফিরে যাচ্ছিল নিজ গ্রামে। এমন সময় নাফ নদীতে বি. ডি. আর. পার্টির কাছে ধরা পড়ে যায় সে। অনেক কাকুতি মিনতি করেছিল তখন, যাতে অন্তত তার বাবার প্রাণ রক্ষার খাতিরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয় কেবল ওষুধগুলো পৌঁছে দেবার জন্য। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। তাকে সোপর্দ করা হয় পুলিশের কাছে। পুলিশ মালসহ তাকে চালান দেয় শহরে। এদেশে তার

Mamun Academy

কোনো বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন নেই, সঙ্গে কোনো টাকা পয়সাও নেই। উকিল মোক্তার সে রাখতে পারেনি। তার জামিন বা বিচারের চেষ্টাও করা হয়নি। তাই ছয় মাস যাবত সে হাজতে বসে শুধু দিন গুণছে। কয়েকবারই তাকে এই কোর্টে এনে আবার ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে এই বলে যে, তার বিচার আজ হবে না। সেজন্যে আজ নরিয়া হয়ে সে কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় এই পথ বেছে নিয়েছে।

ইতিমধ্যে কেসের আসামতও এসে গেছে—ছোট্ট একটি প্যাকেট। খুলে দেখি ওতে আছে এক ফাইল পেটেন্ট ওষুধ, ১২টি ট্যাবলেট, ২টি ইনজেকশন ও তার ডিস্টিল্ড ওয়াটার। আসামীর কাছ থেকে ধৃত এই ওষুধের সঙ্গে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ও ৩১ টাকা ৪০ পয়সার ক্যাশ মেমোটিও গাঁথা আছে।

এই হলো ৩১ টাকা ৪০ পয়সার স্মাগলিঙের এক মামলার বিষয়বস্তু! বাদীপক্ষ ও আসামীর কেসের মধ্যে কোনো গরমিল নেই। বোঝা গেল, আসামীর বিবৃতি সম্পূর্ণ সত্যি,তাছাড়া আসামী তার দোষ স্বীকার করেই নিচ্ছে। এ মামলার বিচার আমাকে আজ করতে হবে।

কি করবো ভাবছি। এ-সময় আমার মানসচক্ষে ভেসে উঠলো —শুধু মানবিক কারণে বিপন্ন মানুষের ডাকে সাহায্যের ডালি নিয়ে এগিয়ে আসবার অসামান্য দু'টি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা যা পড়েছিলাম ইংরেজী সাময়িকীতে। এর একটি ঘটেছিল প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্সের এক যুদ্ধক্ষেত্রে। ঐ সময় ফ্রান্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ 'টানেল' বা পর্বতগুহার দখল নিয়ে দুই শত্রুপক্ষের মধ্যে চলছিল তুমুল যুদ্ধ। টানেলের একপাশে দুর্ধর্ষ জার্মান সেনারা, আর অন্য

Mamun Academy

পাশে ফরাসী ও ইংরেজ বাহিনী জার্মানদের অগ্রগতি রোধ করার জন্য মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত। তুমুল লড়াই চলছে দুপক্ষের মধ্যে ঐ টানেলের দখল নিয়ে। গোলাগুলির ঘায়ে দু'পক্ষেই হতাহত হচ্ছে বহু সেনা। হঠাৎ এক সময় জার্মানদের তরফ থেকে গোলাগুলির শব্দ একেবারে থেমে গেল। এপারে মিত্রপক্ষ ভাবলো—জার্মানরা কি রণে ক্ষান্ত দিয়ে আত্মসমর্পণ করছে। এমন সময় দেখা গেল ওপারে একটি রেডক্রসের পতাকা উড়লো। ঐ পতাকা দেখে এ পক্ষের সেনাপতিও যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিলেন। এবার রেডক্রসের পতাকা উড়িয়ে ওদিক থেকে আস্তে আস্তে এদিকে এগোতে লাগলো একটি রেডক্রসের জীপ। জার্মান রেডক্রসের পক্ষ থেকে জরুরী এক আবেদন নিয়ে এসেছে ঐ গাড়ি,—ওপারে বহু জার্মান সৈন্য মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে,কিন্তু তাদের জীবন রক্ষার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid) দেবার মতো ফিল্ড ব্যাণ্ডেজ, ওষুধপত্র সব ফুরিয়ে গেছে। এখনই এসব ওষুধপত্র না পেলে অনেক আহত জার্মান সৈন্যকে বাঁচানো যাবে না। তাই এদের অনুরোধ (শত্রুপক্ষের কাছে), অবিলম্বে এসব জিনিস দিয়ে মানবতার খাতিরে ওদের সাহায্য করা যায় কিনা। মনে রাখতে হবে, শত্রুপক্ষের সৈন্যদেরই বাঁচাবার জন্য এই আবেদন। বেঁচে উঠে ওরাই হয়তো আবার অস্ত্র ধরবে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে। কিন্তু মানবতার কারণে মুমূর্ষু রোগীদের বাঁচাবার জন্য এই আহ্বানে সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিল এই পক্ষ। অবিলম্বে এরা সেই রেডক্রসের গাড়ি বোঝাই করে ওষুধপত্র পাঠিয়ে দিল শত্রুপক্ষের ক্যাম্পে। গাড়িটি জরুরী সাপ্লাই নিয়ে ওপারে চলে গেলেই রেডক্রস পতাকা সরিয়ে ফেলা হলো, আর সঙ্গে সঙ্গেই আবার শুরু হলো উভয় পক্ষের

Mamun Academy

মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ ও গোলা বিনিময়।

অন্য ঘটনাটি ঘটে অল্প কিছুদিন আগে।

কোপেনহেগেনের এক রোটারী ক্লাবের পক্ষ থেকে জরুরী এক আবেদন এলো পশ্চিম জার্মানীর মিউনিকের এক রোটারী ক্লাবের সদস্যদের কাছে। কোপেনহেগেনের হাসপাতালে এক মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাবার জন্য একটি জীবনরক্ষাকারী বিরল ওষুধের প্রয়োজন। অনেক চেষ্টা করেও তা ওদেশে পাওয়া যায়নি। জার্মানীতেই ঐ ওষুধটি তৈরি হয়, তাই যদি সেখানকার রোটারিয়ানরা ওর দুটি ফাইল সংগ্রহ করে অবিলম্বে কোপেনহেগেন পাঠাতে পারে তবে একটি মূল্যবান জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে।

সঙ্গে সঙ্গে মানবতার এই আহ্বানে সাড়া পড়ে গেল মিউনিকের রোটারী ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বিরল ঐ ওষুধটি ওখানকার কোনো দোকানে পাওয়া গেল না। এক রোটারিয়ান তখন তার গাড়ি নিয়ে ছুটে গেল ঐ ওষুধ তৈরির ফ্যাক্টরীতে। সেখানে ভাগ্যক্রমে পাওয়া গেল সেই ওষুধ।

এখন সমস্যা দেখা গেল কিভাবে এটা অবিলম্বে সুদূর কোপেনহেগেনে পাঠানো যায়। ঐ দুই অঞ্চলের মধ্যে আগামী কয়েকদিন কোনো প্লেন সার্ভিস নেই। তবু হাল ছাড়লো না জার্মান রোটারিয়ানরা। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তারা চাঁদা তুলে বহু অর্থ ব্যয়ে একটি বিশেষ চার্টার প্লেন ভাড়া করে ফেললো। সেই প্লেনে একজন জার্মান রোটারিয়ান সেই ওষুধ নিয়ে কোপেনহেগেনের ঐ হাসপাতালে পৌঁছুলো মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই, যার ফলে বেঁচে গেল একটি অমূল্য জীবন। এই সাফল্যের খবর পেয়ে জার্মান রোটারিয়ানদের মধ্যে সেদিন আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। ভিন্ দেশের অজানা অচেনা এক

ব্যক্তির জীবন বাঁচাবার কি দুরন্ত আগ্রহ দেখিয়েছিল সেদিন জার্মান রোটারিয়ানরা !

কলমহাতে নিয়ে ভাবছি,—এদের তুলনায় আজ আমরা কোথায় নেমেগেছি ? আমার সামনে যে আসামী হাজির তার অপরাধ সে তার পিতার জীবন রক্ষার তাগিদে মাত্র ৩১ টাকা ৪০ পয়সার কয়েকটি ওষুধ কিনেছে। কিন্তু তা পৌঁছে দিতেও পারলো না তার মুমূর্ষু বাবার কাছে গত ছয় মাসের মধ্যে। বলা হয়, আইন অন্ধ। কিন্তু তাই বলে কি এর প্রয়োগকারীরা মানবতারও কোনো মূল্য দেবে না ? আজ বিচারকের আসনে বসে এমন এক আসামীর বিচার আমাকে করতে হচ্ছে। আমার বিচারবুদ্ধি মতে, নিজস্ব জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য ঐ সামান্য কয়েকটি ওষুধ দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অপরাধে আসামীকে আমি স্মাগলিঙের দোষে দোষী সাব্যস্ত করতে পারলাম না। বিবেক আমাকে বাধা দিল।

কিন্তু অন্য একটি অপরাধ সে অবশ্যই করেছে। বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়া ভিন্নদেশ থেকে এদেশে প্রবেশ করে সে এ দেশের আইন ভঙ্গ করেছে। এ অপরাধে তাকে অবশ্যই সাজা পেতে হবে,—যদিও তার খারাপ কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। কেস রেকর্ডের 'অর্ডার শীটে' তখনই সংক্ষেপে মামলার রায় লিখে ফেললাম : ভিন্ন দেশের বাসিন্দা হয়ে বেআইনীভাবে এদেশে প্রবেশের অপরাধে তাকে কুড়ি টাকা জরিমানা অনাদায়ে সাত দিনের জেল দেয়া হলো। অবশ্য স্মাগলিঙের চার্জ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হলো। কিন্তু এই দরিদ্র, নিরীহ আসামীকে স্বহস্তে জরিমানা করায় নিজ বিবেকের কাছে আমি কি কৈফিয়ত দেবো ? হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি এলো,—এই জরিমানার টাকাটা আমি নিজে দিয়ে দিলে বোধহয় বিবেকের

Mamun Academy

বংশন হতে রেহাই পাবো।

রায় লিখে কেস রেকর্ডটি পেশকারের হাতে দেবার সময় আমি পকেট থেকে বিশটি টাকা বের করে তার হাতে দিয়ে বললাম—'এই নিন ওর জরিমানার টাকা। কেস রেকর্ডে জরিমানার টাকা আজই আদায় হয়েছে লিখে নিয়ে এখনই আসামীকে ছেড়ে দেবার কাগজ লিখে আনুন, আমি সেটা সই করে তবে বাড়ি ফিরবো। সেই সঙ্গে আজই আসামীর ওষুধ ও প্রেসক্রিপশনও তাকে ফেরত দিয়ে দেবেন।'

আসামীকে ডেকে বলে দিলাম—'এখন তুমি মুক্ত। ওষুধগুলো নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারো তোমার বাড়িতে ফিরে যাও। আশা করি তোমার বাবা এখনও বেঁচে আছেন।'

উকিল সাহেব রায়ের মর্ম আসামীকে বুঝিয়ে দিলেন। চেয়ে দেখি ও উপরের দিকে দু'হাত তুলে সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে, আর ওর দু'চোখ বেয়ে দরদর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে—নিশ্চয়ই তা আনন্দাশ্রু।

এ সময়ে কোর্টে উপস্থিত অনেকেই নিজেরা চাঁদা তুলে আসামীর বাড়ি ফিরবার খরচও জোগাড় করে দিল।

সব সেরে কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসতে সেদিন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল—টেনিস মাঠে আর যাওয়া হলো না। তবুও অপার আনন্দ নিয়ে ঘরে ফিরলাম সে-রাতে।

Mamun Academy

নরমাংসের কসাই

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের হাতেই যুগে যুগে খুন হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। এসব খুনের অধিকাংশেরই কারণ হিসেবে রয়েছে প্রধানতঃ অর্থলিপ্সা, হতাশ প্রেম ও শত্রুতা। কিন্তু অবলীলাক্রমে শুধু দাঁতে কামড়ে মানুষ খুন করে সেই নরমাংস মানুষেরই আহারের জন্য কসাই-খানায় বিক্রি করার কাহিনী খুব বেশি নেই। এরকম এক নরমাংসের কসাইয়ের কাহিনী পাওয়া যায় জার্মানীর অপরাধ-ইতিহাসে। প্রায় ৫০ জন যুবককে হত্যা করে তাদেরই মাংস বিক্রি করেছিল নিঃসঙ্কোচে বহুদিন ধরে। শোনা যাক সে-কাহিনী :—

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় ও ১৯১৮ সালে ভার্সাই সন্ধির পরপরই পঙ্গু ও বিপর্যস্ত জার্মানী এক ভয়াবহ খাদ্যাভাব ও বেকার সমস্যার সম্মুখীন হয়। সে-সময় অধিকাংশ জার্মান অনাহারে বা অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছিল। বিশেষ ভাবে হ্যানোভারের দুরবস্থাই তখন চরমে উঠেছিল। আর সেই অবস্থার সুযোগ নিয়েই জার্মান যুবক হ্যারম্যান হয়ে উঠেছিল জার্মান ইতিহাসের কতগুলি জঘন্যতম খুনের নায়ক। সে ছিল তার বাবা-মার অসুখী সংসারের ৬ষ্ঠ সন্তান। ১৮৭৯ সালে হ্যানোভারে তার জন্ম হয়। তার মা ছিল বাবার চেয়ে সাত বৎসরের বড়। 'মার' খুব আদরের সন্তান ছিল হ্যারম্যান। ছেলেবেলা থেকেই সে বাইরে খেলাধুলা অপছন্দ করতো। ১৬ বৎ-

Mamun Academy

সর বয়সে তাকে নিউব্রিসাচ সামরিক স্কুলে ভর্তি করা হয়। কিন্তু মূর্খ। যাবার অসুখ থাকায় সেখান থেকে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। তার বাবা তখন তাকে এক চুরুটের ফ্যাক্টরীতে কাজে লাগিয়ে দেয়। কিন্তু সে ছিল অলস ও অকর্মণ্য,ফলে সেই চাকরীও সে হারালো। তারপরেই দেখা গেল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে অপকর্মে লিপ্ত হতে চেষ্টা করছে। এ কারণে তাকে একটি মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হলো চিকিৎসার জন্য। কিন্তু সেখান থেকেও সে পালিয়ে গেল ছয় মাসের মধ্যেই।

এরপর সে ছোট ছোট চুরি ও পকেট মারার কাজে লিপ্ত হলো। আবার মাঝে মাঝে সে বাচ্চাদের সঙ্গে আপত্তিকর যৌন ক্রিয়া-কলাপেরও চেষ্টা করতো। অবশ্য ১৯০০ সালে সে একবার স্বাভাবিক যৌন জীবন ফিরে পায়, তখন সে একটি মেয়েকে ফুসলিয়ে তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করে। একটি বাচ্চাও হয় তাদের এ সময়ে। কিন্তু ঘরে মন বসার মতো মানসিক অবস্থা হ্যারম্যানের কোনোদিনই ছিল না। হঠাৎ সে একদিন সাংসারিক জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঘর থেকে পালিয়ে সেনাদলে যোগ দিল। ১৯০৩ সাল পর্যন্ত সে রেজিমেন্টে কাজ করে, তারপর সেখান থেকেও সে পালিয়ে আবার হ্যানোভারে চলে আসে।

তাকে নিয়ে তার বাবা পড়ে যায় মহা সমস্যায়, কারণ স্বাভাবিক জীবন যাপন ছিল হ্যারম্যানের রুচির সম্পূর্ণ বাইরে। তার বাবা এ সময় উন্মাদ ঘোষণা করে তাকে পুনরায় মানসিক হাসপাতালে ঢোকাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। বাবা-মার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরপর থেকে সে হ্যানোভারে চুরি, পকেটমারা ও জালিয়াতির ব্যবসা শুরু করে দিল। কয়েকবার পুলিশের কাছে ধরা পড়ে তার

Mamun Academy

কিছুদিন জেলও হয়।

জেল থেকে বেরুবার পর তার পিতা তাকে একটি মাছ-মাংসের দোকান করে দেয়। কিন্তু সৎপথে কষ্ট করে অর্থোপার্জন হ্যারম্যানের ধাতে সইলো না। কিছুদিনের মধ্যেই সে দোকানের পুঁজি বিক্রি করে সব টাকাপয়সা নিয়ে পালিয়ে গেল। ১৯১৪ সালে একটি আবগারী দোকান থেকে মালামাল নিয়ে পালাবার সময় ধরা পড়ে গিয়ে তার পাঁচ বৎসরের জেল হয়ে গেল। এরপর ১৯১৮ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সে একটি চোরা-কারবারীর দলে যোগ দেয়। এখানে অল্পদিনের মধ্যেই সে প্রচুর টাকা রোজগার করে। শহরের ২৭ নং সেলার ট্রসিতে এবার আস্তানা গেড়ে সেখান থেকে সে চোরা-কারবারী, চুরি, রাহাজানি এইসব বদ কাজ শুরু করে দেয়। সেই সঙ্গে পুলিশের গুপ্তচরের খাতায়ও সে নাম লেখালো। পুলিশের গুপ্তচর হওয়ায় তার সুবিধা হয়েছিল এই যে,পুলিশ তার প্রতি আর মোটেই কড়া নজর রাখতো না। পুলিশের বন্ধু হয়ে তার চোরা-কারবারীর কাজেও অনেক সুবিধা হলো।

প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি হিসেবে ১৯১৮ সালে ভার্সাই সন্ধির পর জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ট্রেন ভর্তি বাস্তুত্যাগীরা দলে দলে হ্যানোভার শহরে আসতে শুরু করলো। হ্যারম্যান ঐ দুঃসময়ে লোকের দুর্গতির সুযোগ নিয়ে রেল স্টেশন থেকে নিঃসঙ্গ যুবক ও বাস্তুহারাদের বেছে বেছে মিষ্টি কথায় তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ওদের খাদ্য ও আশ্রয় দেবার লোভ দেখিয়ে তার আস্তানায় নিয়ে আসতো।

১৭ বৎসরের সুশ্রী যুবক ফ্রিডেল রোথ যুদ্ধ শেষে ঐ সময় দূরবর্তী গ্রাম থেকে হ্যানোভার শহরে এসেছিল কাজের খোঁজে, যাতে

Mamun Academy

সে তার দরিদ্র পরিবারকে সাহায্য করতে পারে। হ্যানোভার স্টেশনে ট্রেন থামতেই হ্যারম্যানের নজর পড়ে ঐ যুবকের দিকে। তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ওর আস্থাভাজন হয়ে, আশ্রয় ও চাকরী দেবার লোভ দেখিয়ে হ্যারম্যান ওকে নিজের বাসায় নিয়ে এলো। রাতে ক্লান্ত রোথকে খাইয়ে দাইয়ে হ্যারম্যান তার নিজের বিছানার একপাশে শুতে দিল। গভীর রাতে আদিম কামনার তাড়নায় হ্যারম্যান ওর সঙ্গে অস্বাভাবিক যৌন-ক্রিয়ায় লিপ্ত হতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই কুকার্যে রোথ ওকে প্রাণপণে বাধা দেয়। ক্ষিপ্ত হয়ে হ্যারম্যান তার টুঁটি চেপে ধরে। রোথও তাকে লাথি মেরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। হ্যারম্যান তখন ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে বাঘের মতো টুঁটি কামড়ে ধরে—এক হ্যাঁচকা টানে নৃশংসভাবে তা ছিঁড়ে ফেলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে হ্যারম্যানের নাক-মুখ ভেসে গেল, কিন্তু তারপরও সে কামড়ে ওর গলার শ্বাসনালী পুরোপুরি ছিঁড়ে দিল। অচিরেই রোথ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। ঘটনাক্রমে এটাই হ্যারম্যানের জীবনের প্রথম নরহত্যা।

ব্লাগের মাথায় হঠাৎ এই কাণ্ড করে বসে এখন রোথের লাশ নিয়ে সে পড়লো মহা বিপদে। ভোর হবার আগেই এটা এখান থেকে সরানো দরকার। কিন্তু কিভাবে কোথায় তা সামলানো যায়? হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। নিকটেই ছিল কয়েকটি মাংসের দোকান। যুদ্ধের পরপর দেশে তখন মাংসের প্রচণ্ড অভাব। সকাল থেকেই লোকেরা লাইন ধরতো মাংসের দোকানের সামনে কয়েক টুকরো মাংস কিনবার আশায়। কিন্তু আমদানীও চোরা পথে প্রাপ্ত মাংসের পরিমাণ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। তাই সবার ভাগ্যে সেই মাংস জুটতো না। এর আগেও হ্যারম্যান

চোরা কারবার করে মাংস এনে ঐসব দোকানে ভালো দামে বিক্রি করেছে। তাই ভাবলো,এই সুযোগে যদি রোথের মৃতদেহের চামড়া ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে শূকরের মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে দোকানে দিয়ে দেয় তবে তা বেশ বিক্রি হয়ে যাবে। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে—মৃতদেহটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আবার ওর মাংস বিক্রি করে বেশ টাকাও পাওয়া যাবে। টাটকা মাংসের তখন যা দাম!

চমৎকার বুদ্ধি! মাংস কাটার অস্ত্রপাতি ওর ঘরেই ছিল। আর দেরি না করে সে বসে গেল রোথের লাশ নিয়ে। প্রথমে লাশটি টুকরো টুকরো করে কেটে ওর হাত, পা, নাড়িভুঁড়ি সব আলাদা করে মাটিতে পুঁতে ফেললো। শুধু মাথাটি কাগজে মুড়ে তার স্টোভের পেছনে লুকিয়ে রাখলো। বাকি সব মাংস ছোট ছোট টুকরো করে চোরা পথে আনা শূকরের কাঁচা মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে শেষ রাতেই হ্যারম্যান তা বিক্রি করে ফিরে এলো নিকটবর্তী মাংসের দোকানে। পরদিন সকালেই শূকরের মাংস মনে করে লাইন ধরে সেই মাংস কিনে নিল দুর্ভিক্ষ পীড়িত হ্যানোভারের অধিবাসীরা।

এদিকে রোথের পিতামাতা বেশ কয়েকদিন যাবত ছেলের কোনো হদিস না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন। পিতা রোথের খোঁজে হ্যানোভার চলে এলেন। সেখানে খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, স্টেশন থেকেই রোথ পুলিশের গুপ্তচর হিসেবে পরিচিত হ্যারম্যানের সঙ্গে গিয়েছিল। রোথের অসহায় পিতা পুলিশের শরণাপন্ন হলেন। পুলিশ এসে হ্যারম্যানের বাড়ি তল্লাশি করলো, কিন্তু সেখানে রোথকে না পেয়ে ফিরে গেল। পুলিশ কিন্তু আর একটু সন্ধানী হলেই দেখতে পেতো যে তখনো কাগজে মোড়া রোথের মাথা খুনী হ্যারম্যানের ঘরে

স্টোভের পেছনে লুকানো আছে।

এর পরপরই কিন্তু পুলিশ হ্যারম্যানকে হাতেনাতে ধরে ফেললো আরেকটি বালকের সঙ্গে তার বাড়িতে কুকার্যে লিপ্ত অবস্থায়। বিচারে এবার তার নয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেল থেকে বেরিয়ে সে হ্যানোভারের নিউ এসট্রাসি এলাকায় বাসা নিলো। এখানেই হ্যানস্ গ্রানস্ নামের আর একজন সমকামীর সঙ্গে তার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। হ্যানস্ও ছিল এক ছিঁচকে চোর ও নিষিদ্ধ পণ্যের দালাল। দুজনের মধ্যে বেশ মিল হলো। তারা এক কুখ্যাত কফিখানায় আসর জমাতো। পয়সা কামাই করার সহজ উপায় হিসেবে হ্যারম্যান তাকে নরমাংস বিক্রি করার ঐ কথা বলে তাকেও দলে ভিড়ালো। দুজন হলে কাজের অনেক সুবিধা। এরপর দুজনে মিলে নরমাংসের সেই পৈশাচিক ব্যবসা শুরু করে দিল নতুন উৎসাহে।

রেল স্টেশন থেকে কৌশলে তারা কিশোর ও যুবকদের লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসতো হ্যারম্যানের নতুন বাসায়। রাতে হ্যারম্যান শিকারী বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তো নিদ্রারত ঐ যুবকদের ওপর, আর সঙ্গে সঙ্গে শুধু দাঁত দিয়েই কামড়ে কণ্ঠনালীসহ ওদের গলার অর্ধাংশ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। কিনকি দিয়ে রক্ত বেরোত ঐ ছিন্ন গলা দিয়ে আর লাল হয়ে যেতো হ্যারম্যানের নাক, মুখ, মাথা, বুক ইত্যাদি। নরখাদক বাঘের মতো ক্ষিপ্রতা সে এমন নিখুঁতভাবে চালাতো যে, ঐ আক্রমণে তার শিকার কোনো প্রকার বাধা দেবারও সুযোগ পেত না। প্রথমেই সে এমনভাবে কণ্ঠনালী ছিঁড়ে নিত যে নিহত বালক টুঁ শব্দটিও করতে পারতো না। পরবর্তীকালে বিচারের সময় হ্যারম্যান কোর্টে স্বীকার করে যে,

সে ইচ্ছে করেই ঐসব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে কোনো অস্ত্র ব্যবহার না করে শুধু নিজের ধারালো দাঁতই ব্যবহার করতো। আর পৈশাচিক ভাবে নরহত্যা করে সে এক বিচিত্র যৌন উন্মাদনা উপলব্ধি করতো, যে আনন্দের কোনো তুলনা তার কাছে নেই। ঐ বিচিত্র আনন্দের লোভেই সে বারবার দাঁতে টুঁটি ছিঁড়ে হত্যা করছে একের পর এক যুবকদের। শিকার ঐভাবে ধরাশায়ী হলেই দু'বন্ধু বসে যেত রাতেই লাশ টুকরো টুকরো করে কেটে শূকরের মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে। সেই সময় লাশের মাথা, হাত, পা, নাড়ি-ভুঁড়ি, চামড়া,—অর্থাৎ শরীরের যেসব অংশ দেখে তা মানুষের মাংস বলে সহজে ধরা যেতে পারে সেগুলো আলাদা করে ব্যাগে ভরে অন্যত্র সরাবার জন্য রেখে দিত। ভোর হবার আগেই তারা ঐ মাংস গোপনে চোরাপথে আনা শূকরের মাংস বলে দোকানে বিক্রি করে আসতো। লাশের মাথা, হাত, পা, ও ভুঁড়ি রাতেই গোপনে নিকটবর্তী নদীতে ফেলে দিয়ে আসতো। মৃতের পরিধেয় কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিসও তারা রেখে দিয়ে সুযোগমত পুরানো জিনিসের দোকানে বিক্রি করে দিত। এভাবে পয়সা কামিয়ে বেশ সচ্ছল হয়েছিল ওরা।

সমস্ত শিকারের মধ্যে কেবল কেইমেস নামের একজন বালককেই সে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেছে। এছাড়া বাকি সবাইকেই দাঁত দিয়ে কামড়ে মেরেছে হ্যারম্যান। কেইমেসের খুনের ঘটনাটা নিয়ে তখন এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল জার্মানীতে। বালক কেইমেস যথাসময়ে বাড়ি ফিরে না আসায় বাবা-মা অস্থির হয়ে খবরের কাগজে তার নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ প্রচার করে। সেই সঙ্গে তাঁরা আরও ঘোষণা করে যে সঠিক সংবাদদাতাকে আকর্ষণীয় পুরস্কারও

দেয়া হবে। সংবাদ পত্রে ঐ ঘোষণা পড়ে হত্যাকারী হ্যারম্যান নিজেই গিয়ে হাজির হলো শোক-সন্ত্রস্ত কেইমেসের পিতামাতার কাছে। সেখানে নিজেকে সে একজন ভালো ডিটেকটিভ বলে পরিচয় দিয়ে তাদের আশ্বাস দিল যে আগামী তিন দিনের মধ্যেই সে তাঁদের হারানো সন্তানকে খুঁজে বের করে তাঁদের সামনে হাজির করবে। এর আগেই হ্যারম্যানের সাথে তার বন্ধু হ্যানস্ গ্রানসের বিরোধ বেধে যায় এবং দুজন আলাদা হয়ে যায়। গ্রানসকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে হ্যারম্যান পুলিশের কাছে গিয়ে জানালো, তার এককালের বন্ধু গ্রানসই নিখোঁজ কেইমেসকে খুন করেছে। পুলিশ তদন্ত করে দেখলো যে ঐ বালক নিখোঁজ হওয়ার আগে থেকেই গ্রানস অন্য একটি কেসে জড়িয়ে জেল হাজতে ছিল, তাই পুলিশ হ্যারম্যানের অভিযোগে কোনো গুরুত্ব দেয়নি।

কয়েকবার হ্যারম্যান অল্পের জন্য ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিল। একবার তার দেয়া মাংস কিনে একজন ক্রেতার সন্দেহ হয় যে তাকে মানুষের মাংস বিক্রি করা হয়েছে। সে পুলিশকে জানালে পুলিশ ঐ মাংসের নমুনা নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠায়। পরীক্ষক ঐ মাংস ভালো করে পরীক্ষা না করেই জানায় যে ওটা শূকরেরই মাংস। ভাগ্যক্রমে এ যাত্রা বেঁচে গেল হ্যারম্যান। আর একদিন সে যখন সদ্য খুন করা কাটা মানুষের মাংস একটি বড় গামলায় ভরে উপরটা কাগজে ঢেকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল, তখন একজন পড়শী তাকে সিঁড়িতে থামিয়ে কথা বলতে শুরু করলো। ঠিক ঐ সময় পাত্রের উপরের মাংস ঢাকা কাগজটি হঠাৎ বাতাসে উড়ে যায়। দেখা গেল পাত্রে ও কাগজে টাটকা রক্ত লেগে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠে লোকটি জিজ্ঞেস করলো,—'তোমার

পাত্রে কিসের মাংস, হ্যারম্যান?' 'আস্তে বলো। এতে আছে চোরাই পথে আনা শূকরের মাংস। তাই তো সাবধানে ঢেকে নিয়ে চলেছি।' এই বলে হ্যারম্যান তাড়াতাড়ি কাগজটি উঠিয়ে মাংস ঢেকে নিয়ে দ্রুত নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। পড়শীরা জানতো যে হ্যারম্যান চোরাই মাংসের কারবার করে, তাই আর কিছু বলেনি, যদিও মাংসের দিকে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই আঁতকে উঠেছিল ঐ লোক।

এসময় হ্যানোভারের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু ছেলের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ আসতে লাগলো পুলিশের কাছে। ঐ সব ছেলেদের অনেক খোঁজাখুঁজির পরও কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না। পুলিশ ও অন্যান্য অনেকে হ্যারম্যানের সন্দেহজনক গতিবিধির জন্য তার প্রতি সন্দেহ পোষণ করতো। কিন্তু তখন পর্যন্ত ওর বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়ায় পুলিশ তাকে এ সবের সঙ্গে জড়াতে পারছিল না। সেই সুযোগে হ্যারম্যানও মাসের পর মাস সবার চোখে ধুলো দিয়ে নরমাংসের ব্যবসা চালিয়ে যেতে লাগলো।

স্থানীয় পুলিশ এ অঞ্চলের নিখোঁজ ছেলেদের সন্ধান দিতে ব্যর্থ হওয়ায় রাজধানী বার্লিন থেকে দুজন ডিটেকটিভকে পাঠানো হলো এ সম্বন্ধে তদন্ত করতে। গোপন তদন্তের সময় তারা হ্যারম্যানের উপরও নজর রাখলো। এক বালকের সঙ্গে কুকার্যে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে তাকে আবারও গ্রেফতার করা হলো। অবশেষে ১৯২৪ সালের মে মাসে নদীর তীরে একটি মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেল। কয়েক সপ্তাহ পরে ঐ নদীর পাড়েই আরো একটি মাথার খুলি পাওয়া গেল। অনেকেই সন্দেহ করলো নিরুদ্দেশ ছেলেদেরই মাথার খুলি হবে ওগুলো। আর একদিন দেখা গেল, হ্যারম্যানের

Mamun Academy

বাড়িওয়ালীর ছেলে যে সুন্দর কোটটি গায়ে দিয়ে আছে,সেটি এক-জন নিখোঁজ ছেলের গায়ের কোট। অনুসন্ধান করে জানা গেল হ্যার-ম্যানই নাকি তার কাছে ঐ কোটটি অল্প দামে বিক্রি করেছে। এরপর পুলিশ হ্যারম্যানের ঘর তল্লাশি করলো। সেখানে পাওয়া গেল বহু হারানো ছেলের গায়ের জামাকাপড় ও অন্যান্য পরিধেয় জিনিসপত্র। এ-সময় নদীর পাড়ে ক্রীড়ারত কয়েকজন বালক দেখতে পেল অনেক-গুলো মানুষের হাড়। সেগুলো সব পুলিশ তাদের হেফাজতে নিয়ে নিল। পরদিন আবার ঐ নদীর তীরেই পাওয়া গেল বস্তা ভর্তি আরো অনেক হাড়গোড়। ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেল ওগুলো সব মৃত মানুষের হাড়। আর ওখানে ছিল কমপক্ষে ২৭ জন লোকের অস্থি।

এবার স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশ নিঃসন্দেহ হয়ে হ্যারম্যানকে গ্রেফতার করলো। সেই সঙ্গে তার সহকর্মী হ্যান্স গ্রান্সও ধরা পড়লো। এবার হ্যারম্যান সব দোষের স্বীকারোক্তি করলো। তাতে সে বিশদভাবে জানালো কিভাবে একে একে সে প্রায় ৫০ জন বালক-কে টুঁটি কামড়ে হত্যা করেছে। আর তাদেরই মাংস শূকরের মাংস বলে চালিয়ে দিয়েছে—যার সবটুকুই হ্যানোভারের লোকেরা পরম তৃপ্তিভরে খেয়েছে। তার সব শিকারেরই বয়স ছিল ১৩ থেকে ২০ বৎসরের মধ্যে। মেয়ে বা বড়দের কাছ থেকে সে দূরে থেকেছে। এদের মধ্যে একজন বালককে সে হত্যা করে শুধু তার পরিধেয় অতি সুন্দর প্যান্টটির লোভে। তাকে মেরে ঐ প্যান্টটি সে বেশ চড়া দামে বিক্রি করে।

এই চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার শুরু হয় ১৯২৪ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর হ্যানোভার কোর্টে। একনাগাড়ে ১৪ দিন ধরে চলে এই

বিচার। মোট ১৩০ জন সাক্ষীকে কোর্টে পরীক্ষা করা হয়। বিচারের সময় হ্যারম্যান তার দোষ স্বীকার করে হত্যার কারণ সম্পর্কে বলে যে অর্থলোভের চেয়ে সে বালকদের ঐভাবে হত্যা করে এক পরম যৌন উত্তেজনা ও তৃপ্তি লাভ করতো। ডাক্তারেরা তাকে পরীক্ষা করে বলেছেন, এক বিকৃত যৌন উত্তেজনার তাড়নায়ই পৈশাচিক ভাবে ঐসব খুন করে হ্যারম্যান এক পরম তৃপ্তি লাভ করতো।

মামলা চলাকালীন সময় হ্যারম্যানকে কিন্তু বেশ প্রফুল্ল ও ভাবনাহীন দেখাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে নিজেই কোর্ট ও সাক্ষীদের প্রশ্ন করে বিব্রত করছিল। একবার সে পরিপূর্ণ কোর্টরুমের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো যে, তার এই মামলায় এত মেয়েলোক ভিড় করছে কেন? উত্তরে বিচারক জানালেন যে, মুক্ত কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে কাউকেই বের করে দেবার অধিকার তাঁর নেই। একজন মহিলা সাক্ষী তার হারানো প্রিয় সন্তান সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ভয়ানক অভিভূত হয়ে পড়লো। তাই দেখে হ্যারম্যান আসামীর কাঠগড়া থেকে বিরক্তি প্রকাশ করে জজ সাহেবের কাছে অনুমতি চাইলো একটি সিগ্রেট খাওয়ার। সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেই অনুমতি দেয়া হলো।

আসামী তার বিবৃতিতে অকপটে কোর্টের কাছে সব বলে ও অধিকাংশ অভিযোগই স্বীকার করে নেয়। তবে উলফ্ নামে একজন নিখোঁজ কুৎসিত বালকের ফটো দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে একেও সে খুন করেছে কিনা। উত্তরে হ্যারম্যান ছবিটির দিকে একবার তাকিয়ে ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে জানায় যে ঐ রকম কদাকার ছেলেদের প্রতি সে কোনোদিনই উৎসুক ছিল না।

বিচারে হ্যারম্যানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আর তার সহকারী গ্রানসকে দেয়া হয় ১২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড।

Mamun Academy

অতৃপ্ত বাসনা

১৯৭২ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনে উচ্চ সমাজের এক চাঞ্চল্যকর যৌন কেলেঙ্কারীর কথা ফাঁস হয়ে তা কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। আর সেই সঙ্গে দেশ বিদেশের পত্র পত্রিকায় ঐ মুখরোচক কাহিনী ফলাও করে প্রকাশ করা হয়।

সুবিখ্যাত কলগার্ল ক্রিস্টিন কিলারের সঙ্গে তৎকালীন বৃটেনের মন্ত্রী মিঃ প্রফুমো ও দেশ বিদেশের অন্যান্য বহু মহারথীদের (যাদের মধ্যে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিঃ আইউব খানও জড়িত ছিলেন) যৌন কেলেঙ্কারীর কাহিনী প্রকাশিত হবার পর বোধ হয় এই ঘটনাটিই ইংলণ্ডের উচ্চ মহলের ন্যাক্কারজনক ব্যভিচারের আর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

ইংলণ্ডের কোটিপতি ব্যবসায়ী স্যার ফ্রান্সিস পীক ছিলেন এক-জন স্বনামধন্য ব্যক্তি। তাঁর যুবতী তন্বী স্ত্রী লেডি পীক্ নাম করা সুন্দরী হিসেবে উচ্চ মহলে সুপরিচিতা ছিলেন। মধ্য বয়সী স্যার ফ্রান্সিস তাঁর বিশাল ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন সারাক্ষণ। দেশ বিদেশে অনবরত ঘুরতে হতো তাঁকে ব্যবসার কাজে। ছেলে-পিলেও হয়নি তাঁদের। এদিকে ঘরে একাকী তরুণী স্ত্রীর অশান্ত মন গুমরে গুমরে কাঁদে। এসব ধন দৌলত তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হয়।

Mamun Academy

লেডি পীকের আসল নাম ক্যারোলীন কার্ক উড পীক্। তাঁর পিতা রবার্ট কার্ক উড ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত বংশের সম্পদশালী ব্যক্তি। আফ্রিকার জ্যামাইকাতে তাঁর ছিলো বিরাট ব্যবসা। ক্যারোলীন পিতা মাতার বড় মেয়ে। প্রাচুর্য ও বিলাসিতার মধ্যে জ্যামাইকাতে কাটে তাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি ইংল্যাণ্ডে চলে আসেন। পাশ্চাত্যের নিয়ম অনুসারে ১৮ বৎসর বয়সেই তিনি স্বাবলম্বী হতে প্রয়াসী হন ও প্রথমে মডেলিংকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। সুন্দরী, সুদেহী পীক মডেল হিসেবে প্রচুর সুনাম অর্জন ও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সময় চিত্র জগতের জন ভল কোজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও পরবর্তীতে প্রেম হয়। ১৯৫৭ সালে তাঁরা উভয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু এ বিয়ে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, ১৯৬৪ সালে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এর তিন বৎসর পর অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে মধ্য বয়সী ধনী স্যার ফ্রান্সিসের নজরে পড়ে যায় ক্যারোলীন। কিছু-দিনের মধ্যেই তাঁদের বিয়ে হয়। সেই থেকে তারা ইংল্যাণ্ডেই বসবাস করে আসছিলেন।

ইংল্যাণ্ডে তাঁদের প্রাসাদোপম বাড়িতে বাবুর্চির কাজে নিয়োজিত ছিল মরিস ওরিগেন নামক এক সুশ্রী যুবক। মরিস মূলতঃ বাবুর্চি হলেও সে একাধারে ছিল বয়, খানসামা ও ড্রাইভার। ঐ বাড়িতেই সে থাকতো ও খেতো। সময় অসময় প্রভু বা প্রভুপত্নীকে এখানে ওখানে পৌঁছে দেবার জন্য ড্রাইভারের কাজও তাকে করতে হতো। প্রকৃতপক্ষে ২৪ ঘণ্টার ডিউটিরত একমাত্র কর্মচারী ছিল মরিস ঐ বাড়িতে। হিসেবী স্যার ফ্রান্সিস কিন্তু তাকে পারিশ্রমিক দিতেন সপ্তাহে মাত্র ১০ পাউণ্ড। ইংল্যাণ্ডের বাজারে ২৪ ঘণ্টা কাজের জন্য ঐ

Mamun Academy

অঙ্ককে নগণ্যই বলতে হবে। তবে প্রভু ও প্রভুপত্নীর ব্যবহারে সে ছিল খুব সন্তুষ্ট। মরিস না হলে পীক্ দম্পতিরও মোটেই চলতো না। নিচের তলার একটি কামরায় মরিস থাকতো। সময় অসময় প্রভুর ডাকে সাড়া দেবার জন্য তার ঘরে একটি টেলিফোনও ছিল।

সেটা ছিল ১৯৭০ সাল। স্যার ফ্রান্সিস সেদিন রাতেই প্লেনে রওনা হবেন বাহামায় এক জরুরী কাজে। মরিস প্রভুকে প্লেনে উঠিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে রাত এগারটায় বাসায় ফিরে এলো। বেশ ক্ষুধা পেয়েছে তার। গাড়ি গ্যারেজে রেখে সে ড্রইংরুম হয়ে গেল রান্নাঘরে। রাত অনেক হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি এক কাপ গরম দুধ খেয়ে শুতে যাবে এই আশায়। রান্নাঘরে সে যখন দুধ গরম করতে ব্যস্ত, এমনি সময় নিঃশব্দে লেডি পীক্ পেছন দিক দিয়ে তার কাছে এসে হাজির।

Mamun Academy

এত রাতে প্রভুপত্নীকে ওখানে দেখে মরিস একটু চমকে উঠলো। মনে করলো বোধহয় কোনো জরুরী প্রয়োজনে তিনি এসেছেন এখানে। ব্যস্ত হয়ে সে বলে—'এতো রাতে উঠে এসেছেন আপনি —আমাকে ডাকলেই পারতেন—বলুন কি করতে হবে?' পরক্ষণেই ভাবলো, বোধহয় সাহেব ঠিকমতো প্লেনে উঠলো কিনা তাই জানতে এসেছেন ম্যাডাম। 'হ্যাঁ সাহেবকে আমি ঠিক উঠিয়ে দিয়ে এসেছি প্লেনে,' ব্যস্তভাবে বলে মরিস।

'সেটা আমি গাড়ির শব্দ পেয়েই টের পেয়েছি। তবে তোমার সাহেবের খবর নিতে আসিনি এত রাতে—মরুকগে সে। আমি এমনি এলাম তোমাকে দেখতে।' রহস্যময় হাসি হেসে উত্তর দেয় লেডি পীক।

শুনে চমকে ওঠে মরিস। লেডি পীকের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে

তার চক্ষু স্থির। দেখে, প্রভুপত্নীর পরনে হাল্কা রাত্রিবাস। তার উপর পাতলা এক ড্রেসিং গাউন যা ভেদ করে বেরিয়ে আসছে তার পীন পয়োধর। চোখে তার কটাক্ষ।

লেডি পীক আরও কাছে এসে মরিসের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললো,—'জান মরিস, এই নিঝুম রাতে আমার একলা মোটেই ভালো লাগছে না। তোমার বাহুলগ্ন হয়ে এখন তোমাকে একটা চুমু খেতে আমার ভীষণ ইচ্ছা করছে।'

হঠাৎ এ প্রস্তাবে মরিস হতভম্ব হয়ে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে প্রভুপত্নী, তার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। আর সে তারই একজন সামান্য বাবুর্চি। ভাবলো, প্রভুপত্নী ঠাট্টা করছে না তো তার সঙ্গে এই গভীর রাতে, নাকি তার বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করতে এসেছেন!

কম্পিত কণ্ঠে সে বলে, 'আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে। শেষ পর্যন্ত আমার চাকরীটাই না চলে যায়।'

অবিচল লেডি পীক এবার ওর কাঁধে হাত রেখে অভয় দিয়ে খিলখিল করে হেসে বলে—'তুমি একটা আস্ত বোকা। এতে কিছু হবে না, বরং আমাকে খুশি করতে পারলে তুমি অনেক লাভবান হবে।'

অগত্যা মরিস রাজি হলো। আলিঙ্গনে ও চুম্বনে চুম্বনে সে লেডি পীককে আরও অশান্ত করে তুললো। এরপর উভয়ে যার যার ঘরে ফিরে গেল।

বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে মরিস ভাবছিল ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ আজ সে কি করে ফেললো! স্যার পীক ঘুণাক্ষরেও একথা জানতে পারলে তাকে আস্ত রাখবেন না। আবার ভাবে,—তার কি দোষ? ম্যাডামই তো তাকে প্রলুব্ধ করেছে।

Mamun Academy

এমন সময় হঠাৎ ক্রিং ক্রিং করে তার ফোন বেজে উঠলো, রিসিভার তুলতেই ওপর থেকে প্রভুপত্নীর সুমধুর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—'মরিস, চলে এসো এখনই আমার রুমে, জরুরী কাজ আছে।'

স্যার ফ্রান্সিস আজ বাড়ি নেই। আর কেউ থাকে না এই বিশাল বাড়িতে। লেডি একাই আছে তার ঘরে। এত রাতে আবার কি জরুরী কাজ থাকতে পারে সেখানে,মরিস রিসিভার রেখে ভাবে। আবার কোনো বিপদে পড়বে না তো সে ? কিছুক্ষণ আগেই যা ঘটে গেল !

এমন সময় আবার বেজে উঠলো টেলিফোন। সেই একই কণ্ঠস্বর। তবে এবার অনেকটা মিনতি মাখা সুরে লেডি আবার ডাকছে তাকে—'কোনো ভয় নেই তোমার। নিশ্চিন্তে চলে এসো। আমার একা কেন কেমন ভয় ভয় করছে এ ঘরে।'

অগত্যা মরিস গিয়ে দাঁড়ালো লেডির ঘরের সামনে। দরজা খোলাই ছিল। শব্দ করতেই ভেতরে ঢোকার জন্য ডাক এলো। দামী আসবাবপত্রে সাজানো প্রভুর বেডরুম। মৃদু একটি আলো জ্বলছে এ ঘরে। লেডি শুয়ে ছিল বিছানায়। কম্পিত বুকে ধীর পদক্ষেপে মরিস ঢুকলো সেই ঘরে। ওকে দেখে হেসে ম্যাডাম উঠে এলো বিছানা থেকে মোহিনীরূপে। পাতলা অন্তর্বাসের মধ্যে দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছে তার রূপ-যৌবন।

মিসেস পীক এ অবস্থায়ই এগিয়ে এসে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। হাত ধরে মরিসকে নিয়ে বসালো তার বিছানার পাশে। ওর হাবভাব দেখে এবার মরিসও অনেকটা সহজ হয়ে উঠলো। তার মধ্যেও পুরুষত্ব চাড়া দিয়ে উঠেছে ততক্ষণে। সে-রাতে

Mamun Academy

বহুক্ষণ কাটালো সে লেডি পীকের বেডরুমে একই বিছানায়। লেডির এতদিনের অতৃপ্ত আদিম বাসনা সে-রাতে মরিস পূর্ণ করে দিলো কানায় কানায়।

পাপের পিচ্ছিল পথে যে একবার পা বাড়ায়, সহজে তা থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে অনেক সময় আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ রকমটি ঘটেছিল মরিস ও মিসেস পীকের বেলায়ও। আশ্চর্য এক উন্মাদনায় ভুলে গেল মিসেস পীক যে, তার স্বামী আছে, সংসার আছে —আছে সভ্য দেশের সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা। আর যার সঙ্গে সে আজ পাপের খেলায় মেতেছে, সে তারই অধীনস্থ সামান্য একজন বাবুর্চি মাত্র। কিন্তু প্রেমের খেলা বিচিত্র! কি এক নেশার ঘোরে এই সামান্য বাবুর্চির পদতলেই এই মহিলা নারী জীবনের সর্বস্ব লুটিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে নতুন প্রেমিককে খুশি করার জন্য তার স্বামীর দেয়া একটা মোটা অঙ্কের টাকাও দিল।

দিনে দিনে তাদের মধ্যে পরকীয়া প্রেম হয়ে উঠলো আরও গভীর। প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুবার করে তারা পরস্পরকে চুমু খেতো ও জড়িয়ে ধরে সোহাগ করতো। আর এরই মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝে চলতো তাদের যৌন সম্ভোগ। সাধারণত তারা নির্দিষ্ট স্থানে সন্ধ্যায় ও ভোর বেলায় পরস্পর মিলিত হতো। দ্বিধা সঙ্কোচ সবই কেটে গেল ওদের ক্রমে ক্রমে।

স্বভাবতঃ পুরুষেরাই অগ্রণী হয় প্রেমের খেলায়। আর তারাই টাকা খরচ করে মহিলাদের পেছনে সম্ভোগের বিনিময়ে। এদের বেলায় কিন্তু ছিল তার ব্যতিক্রম। কোর্টে যখন এদের মামলা চলে তখন মরিস অকপটে এ-ও জানায় যে তার প্রতিটি চুম্বনের বিনিময়ে লেডি পীক তাকে দশ পাউণ্ড করে দিত। আর সেই টাকা দিয়ে

Mamun Academy

লেডি পীকের ইচ্ছানুযায়ী মরিস ভালো ভালো কাপড়-চোপড় কিনে ফিটফাট থাকতো।

বেশ কিছুকাল ধরে চলছিল স্বামীর অজান্তে খানসামার সঙ্গে মনিবগিন্নীর এই বিচিত্র প্রেমের খেলা। এমন সময় এলো এক বিপত্তি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭১ সালে মরিস প্রথম জানতে পারলো যে স্যার ফ্রান্সিস ও লেডি পীক ইংল্যাণ্ড ছেড়ে পাকাপাকি-ভাবে স্পেনে বসবাস করতে যাচ্ছেন। প্রথমে স্থির হয়, ওঁরা দুজনে স্পেনে গিয়ে সবকিছু ঠিকঠাক করেই মরিসকেও সেখানে নিয়ে যাবেন। কিন্তু পরে যে কোনো কারণেই হোক, স্পেনে গিয়ে স্যার ফ্রান্সিস এক চিঠিতে মরিসকে জানিয়ে দিলেন যে তাকে স্পেনে নেয়া সম্ভব হবে না, তাই সে যেন আর ওদের আশায় বসে না থেকে নিজের পথ বেছে নেয়।

লেডি পীক কিন্তু ভোলেনি মরিসকে। সে গোপনে এক চিঠি লিখে তাকে জানায়—'মরিস, তোমার চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। তুমি অন্য কোথাও চাকরী নেবে না। আমিই তোমাকে দেখবো। আর তোমাকে স্পেনে নিয়ে আসবার চেষ্টাও আমি করছি।'

লেডি পীক তার কথা রাখার চেষ্টা করেছিল। এর ঠিক এক সপ্তাহ পরেই মরিস আর একটি চিঠি পেল লেডির কাছ থেকে। সেই চিঠির সঙ্গে গাঁথা ছিল লেডি পীকের স্বাক্ষরযুক্ত ব্যাঙ্কের এক-টি সাদা চেক (Blank cheque)। চিঠিতে লেডি লিখেছে ঐ চেকে মরিস তার ইচ্ছামত যে কোনো অঙ্ক বসিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠি-য়ে নিতে পারে। তবে ঐ অঙ্ক যেন বার হাজার পাউণ্ডের বেশি না হয়। চিঠির সঙ্গে ব্ল্যাঙ্ক চেকটি পেয়ে তো মরিসের চক্ষুস্থির। অত

Mamun Academy

টাকা দিয়ে সে তখন কি করবে ! তাই ঐ চেক ভাঙিয়ে সে মাত্র তিন হাজার পাউণ্ড উঠিয়ে নিল ইংল্যাণ্ডের একটি ব্যাঙ্ক থেকে। মরিস আশ্চর্য হয়ে গেল পরপর আরও দুটি চিঠির সঙ্গে লেডি পীকের কাছ থেকে আরও দুটি চেক পেয়ে। প্রতিটি চেক ছিল ৩০০০ হাজার পাউণ্ডের। শেষ চেকটির সঙ্গে লেডির যে চিঠি আসে তাতে লেখা ছিল,—'আমি আমার প্রতিশ্রুতি পালন করছি। তোমার কোনো অভাব হতে আমি দেবো না। তবে আমার কথাও মনে রেখো। খামাকাই আমি তোমাকে এতগুলি টাকা দিচ্ছি না। আমি তোমাকে শিগগিরই স্পেনে দেখতে পাবো বলে আশা করে আছি।'

কিন্তু এরপরই মরিস ওরিগেন ইংল্যাণ্ড ছেড়ে তার জন্মস্থান আয়ারল্যাণ্ডে চলে গেল বেশ কিছুদিনের জন্য। অর্থ চিন্তা তার আর এখন নেই। এরপর লেডি পীকের সঙ্গেও তার আর যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি।

এর কয়েক মাস পরে স্যার ফ্রান্সিস তার স্ত্রী লেডি পীকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে একটি বড় ধরনের গরমিল দেখতে পান। স্ত্রীকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করায় প্রথমে একটু থতমত খেয়ে যায় সে। হিসেবে নয় হাজার পাউণ্ডের বিরাট অঙ্কের গরমিলের কোনো জবাবদিহি সে প্রথমে করতে পারেনি। তার স্বামী যখন এ সম্বন্ধে জানতে আরও চাপ দিলেন, তখন সে ভড়কে গিয়ে এ ব্যাপারে খোঁজ করে জানাবে বলে কথা দেয়। কয়েকদিন পরেই লেডি সমস্ত দোষ ইংল্যাণ্ডের ওদের খানসামা মরিস ওরিগেনের উপর চাপিয়ে দিয়ে বলে যে, তাড়াহুড়োর মধ্যে ওদের ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করার সময় ওরিগেন তার কয়েকটি ব্যাঙ্ক চেক চুরি করে নিয়ে যায়। আর তাই দিয়েই ওর সই জাল করে মরিস ঐ ৯০০০ পাউণ্ড ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়েছে।

Mamun Academy

অনেকদিন মরিসের কোনো পাত্তা না পেয়ে লেডি পীকও চটে গিয়েছিল তার উপরে। কিন্তু এক পাপ ঢাকতে গিয়ে আরও কয়েকটি মিথ্যার আশ্রয় নিল সে, আর অজান্তেই নিজের পাতা ফাঁদে নিজেই শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়লো মারাত্মকভাবে। চেকের সূত্র ধরেই থলের বেড়াল বেরিয়ে বাইরে এলো যার ফলে গিন্নী-খানসামার এই কেলেঙ্কারীর কথা সাধারণ লোক পর্যন্ত জেনে ফেললো।

স্ত্রীর ঐ অভিযোগের পর ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে স্যার ফ্রান্সিস সত্যিই দেখতে পেলেন যে মরিসই তিনটি চেক মারফত হারানো সব টাকা তার স্ত্রীর নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নিয়েছে। ইংল্যাণ্ডে অনেক খোঁজ করেও মরিসের পাত্তা পাওয়া গেল না। ভয়ানক রেগে গেলেন স্যার ফ্রান্সিস মরিসের উপরে। স্বামীর চাপেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও লেডি পীক মরিস ওরিগেনের বিরুদ্ধে জালিয়াতির এক অভিযোগ পেশ করলো লণ্ডন পুলিশের কাছে।

মরিস কিন্তু এসব কিছুই জানতো না। বেশ কয়েকমাস আয়ারল্যাণ্ডে কাটিয়ে সে ফিরে এলো আবার লণ্ডনে। ঐ সময় তার খোঁজ পেয়ে জালিয়াতির অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে হাজতে পুরলো।

যথাসময়ে কোর্টে এই জালিয়াতির মামলা বিচারের জন্য উঠলো। পুলিশের কাছে অভিযোগের জের টেনে লেডি পীক আদালতে প্রকাশ করলো যে,আসামী মরিস তার চেক চুরি করে, তিনটি চেকে তার সই জাল করে নয় হাজার পাউণ্ড উঠিয়ে নিয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে।

ভূতপূর্ব কর্ত্রীর এই অভিযোগ অস্বীকার করে ওরিগেন দৃঢ়কণ্ঠে কোর্টকে জানায় যে, কোনো চেকে সে সই জাল করেনি, তার বিরুদ্ধে আনীত জালিয়াতির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বরং লেডি পীক

Mamun Academy

নিজেই ঐসব চেক সই করে তাকে দিয়েছিল কারণ লেডিকে সে অন্যভাবে সন্তুষ্ট করেছিল। সমস্ত ঘটনা তখন কোর্টের কাছে বেশ জোরালো মনে হলো। কোর্ট প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য বিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কাছে ব্যাপারটির তদন্তের ভার দিলেন।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিশেষজ্ঞরা ব্যাঙ্কের কাগজপত্র, বাদী ও আসামী উভয়ের হস্তাক্ষর বিশদভাবে পরীক্ষা করে তাদের অভিমত জানালো যে ঐ চেক তিনটিতে লেডি পীক নিজেই সই করেছে। ওর কোনটিতেই তার সহি জাল করা হয়নি।

কেঁচো খুঁড়তে এবার সাপ বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হলো। লেডি পীক দেখলো সামনে মহা বিপদ। সে ক্রমে আটকে পড়ছে তার নিজেরই জালে। শেষ রক্ষার আশায় লেডি এবার তার পূর্বের বিবৃতি পাল্টে স্বীকার করে নিল যে চেকগুলোতে সে-ই সই করেছিল, তবে সেগুলো ছিল ব্ল্যাঙ্ক চেক, ওতে টাকার অঙ্ক সে নিজে লেখেনি। তাদের বাসার বাবুর্চি হিসেবে মরিস ওরিগেনই সংসারের সাধারণ খরচ চালাতো। সুতরাং সেই সব খরচের টাকা বাবদ গৃহকর্ত্রী আগে থেকেই সাদা চেকে সই করে তাকে দিয়ে রাখতো। প্রয়োজন মতো টাকার অঙ্ক বসিয়ে সেই টাকা তুলে সংসারের খরচ মেটাতে মরিসকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনোক্রমেই সেই খরচ তিন হাজার পাউণ্ডের বেশি হবার কারণ ছিল না। বাকি টাকা আসামী মরিসই আত্মসাৎ করেছে।

কোর্টে এসে লেডি পীকের মিথ্যা অভিযোগ শুনে বিস্মিত হয় মরিস। নিজেকে বাঁচাবার জন্য ওরিগেন তাদের সম্পর্কের আসল নেপথ্য কাহিনী উন্মুক্ত কোর্টে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়ে বলে, 'তিনি আমাকে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়েছিলেন সত্যি, তবে সংসার খরচ চালাবার

জন্য তা মোটেই দেয়া হয়নি। বরং তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আমাকে ঐ বিরাট অঙ্কের সমুদয় টাকা দিয়েছিলেন। কারণ আমি তাঁর অতৃপ্ত তরুণী হৃদয়ের কামনা বাসনা চরিতার্থ করেছিলাম—তাঁর শয্যাসঙ্গী হয়েছিলাম।' তারপর সে কোর্টে বলে গেল তাদের অবৈধ প্রেমের সমস্ত ঘটনা আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত একে একে।

লেডি পীক মরিয়া হয়ে ঐসব কাহিনী সরাসরি অস্বীকার করে, মরিসকে মিথ্যাবাদী, নিমকহারাম বলে গালাগাল করে। অবশ্য তার সেই অস্বীকৃতির ভাষা মোটেই জোরালো ছিল না। বরং মরিসের পাল্টা অভিযোগে সে যেন বেশ কিছুটা অসহায় ও লজ্জিত হয়ে পড়ে। আর সে-সময় তার চোখও হয়ে উঠেছিল অশ্রুসজল, যা মরিসকে ক্ষণিকের জন্য হলেও ব্যথিত করে তোলে।

আত্মপক্ষ সমর্থনে তাগিদে মরিস কিন্তু তার বক্তব্যে অবিচল থেকে দৃঢ়কণ্ঠে মাননীয় কোর্টকে জানায় যে, সে যা বলেছে তা একান্ত লজ্জাকর হলেও সবই সত্যি। কিছুই সে গোপন করেনি। প্রথমতঃ তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তরুণী গৃহকর্ত্রী তাকে বিপথে চালিত করেছে। আর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে শেষে আবার সেই মহিলা নিজেই তাকে মিথ্যা অভিযোগে জেলে পুরবার চেষ্টা করছে।

কোর্টে মরিস আরো বলে, —'লেডি পীককে 'সুখ' দেয়ার কারণেই সে খুশি হয়ে আমাকে মোট নয় হাজার পাউণ্ডের তিনটি চেক লিখে দিয়েছিল। তবে সব সময় আমারও ভয় ছিল যে হয়ত আমাদের এই যৌন কেলেঙ্কারীর কথা কোনদিন ফাঁস হয়ে যাবে, তখন মনিবের কোপদৃষ্টিতে পড়ে আমার চাকরীটা তো যাবেই তার উপর আরও ক্ষতি হতে পারে। তাই ওরা স্পেনে চলে গেলে আমি এসব থেকে দূরে সরে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এরপরও লেডি

Mamun Academy

পীকের তিন তিনটি চেক গ্রহণ করার পর শেষে বুঝতে পারি যে এখন আমিও তার সঙ্গে একই বড়শিতে আটকে গেছি।'

বিচারের সময় মরিস আরো বলে,—'আমি মোটেই আমার গৃহকর্ত্রীকে হেয় বা অপমানিত করতে চাইনি। সে না চাইতেই আমাকে প্রচুর দিয়েছে, আমি তার কাছে ঋণী। কিন্তু গত দীর্ঘ আট মাস ধরে আমি এক মিথ্যা অভিযোগে জেল হাজতে ধুঁকে ধুঁকে মরছি। কাজেই আমার মুক্তির জন্যই এসব গোপন কথা কোর্টের সামনে আজ খুলে বলতে বাধ্য হয়েছি। এছাড়া বাঁচবার আমার আর কোনো পথ ছিল না। এই সঙ্গে প্রমাণ হিসাবে সে চেকের সঙ্গে পাঠানো লেডি পীকের একটি চিঠিও কোর্টে দাখিল করে।

মরিসকে বিপক্ষের উকিলের জেরার সম্মুখীনও হতে হয়। জেরায় উকিল তাকে প্রশ্ন করেন—'তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, তবে ভবিষ্যতের বিপদের কথা চিন্তা করে সময় থাকতে তুমি লেডি পীকের কুসংস্রব ছেড়ে দাওনি কেন? বিশেষভাবে তিনি যখন তোমার গৃহ-কর্ত্রী?'

উত্তরে মরিস বলে—'হয়তো সেটা আমার দুর্বলতা। তবে এ-ও ঠিক যে, চরম সুখভোগের সময় কেউই পিছিয়ে আসতে চায় না। হতে পারে এটা ছিল আমার জন্যে বামনের চাঁদে হাত দেয়ার মতো। কিন্তু চাঁদ যখন তার সমস্ত আকর্ষণ নিয়ে যেচে আমার হাতের মধ্যে এসে গেল, তখন আমি তা ছেড়ে দিতে পারিনি। আমিও তো এক-জন রক্ত মাংসের যুবা পুরুষ!'

বাদী-বিবাদীর সওয়াল-জবাবের পর আদালত তাঁর রায়ে মরিস ওরিগেনকে নির্দোষ ঘোষণা করে তাকে বেকসুর খালাস দেন। সেই সঙ্গে বিচারক বিনা দোষে আসামীকে দীর্ঘ আট মাস হাজতে আটক

থাকতে হয়েছে বলে দুঃখ প্রকাশ করেন।

ছাড়া পেয়ে আদালত থেকে ফেরার আগে মরিসকে সাংবাদিকরা ঘিরে ধরে নানা প্রশ্ন করে। ওদের এক প্রশ্নের উত্তরে মরিস বলে —'এটাই আমার সান্ত্বনা যে, আমি নির্দোষ ব্যক্তি হিসেবেই ঘরে ফিরে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে কি হবো বা কি কাজ করবো জানি না। তবে জীবনে আর কখনো খানসামার কাজ যে নেবো না তা হলপ করে বলতে পারি।'

এই মামলার পর স্যার আলিস তাঁর স্ত্রী লেডী পীককে গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা জানা যায়নি।

Mamun Academy

নৈশ ক্লাবের ট্র্যাজেডী

ঘটনাটি ঘটেছিল জাপানে ১৯৭২ সালে।

প্রাচ্যের গৌরব জাপান। বলতে গেলে এশিয়ার মধ্যে জাপানই একমাত্র দেশ যে গত বিশ্বযুদ্ধের হত্যা, ধ্বংসলীলা ও আণবিক বিভীষিকার ধাক্কা সামলে উঠে অসীম সাধনাবলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গড়ে তুলেছে এক নতুন জাপান। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও অর্থ সম্পদে জাপান আজ এক পরম বিস্ময়। দেশের এই অভাবনীয় উন্নতিতে বড়দের সাথে সে-দেশের যুবক যুবতীদেরও কঠোর পরিশ্রমের ফল এই আধুনিক জাপান। শিল্প অগ্রগতির সাথে সাথে আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে জাপানের লেনদেন ও যাতায়াত ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধুনিক সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার ঢেউ এসে প্রাচ্যের সনাতনী জাপানী সমাজে এনে দিয়েছে এক মহা আলোড়ন, বিশেষ ভাবে যুব সমাজে। আধুনিক জাপানে অনেক মেয়ে পুরুষই আজ বহু যুগের ঐতিহ্যবাহী জাপানের প্রাচীন পোশাক পরিচ্ছেদ ও সমাজ ব্যবস্থা ছেড়ে পাশ্চাত্যের চাকচিক্যময় আধুনিক সভ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। আর সেই সঙ্গে আজ জাপানের সর্বত্র বড় বড় কল কারখানার পাশাপাশি গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্য কায়দায় পরিচালিত বড় বড় হোটেল, নৈশ ক্লাব, প্রমোদশালা ইত্যাদি।

Manik Academy

অগ্রগতির সাথে সাথে আর্থিক প্রাচুর্যের ঢলও এসে লেগেছে প্রায় সর্বস্তরের জাপানীদের মধ্যে। সারাদিন কলকারখানায় বা অফিসে কঠোর পরিশ্রমের পর সেখানকার বহু কর্মীই আজকাল কাজশেষে বা ছুটির দিনে আনন্দের আশায় ভিড় জমায় ঐসব মোটেল, নৈশক্লাব বা প্রমোদশালায়। বেছে বেছে শত শত জাপানী যুবতীদের নিয়োগ করা হয় ঐ সব প্রমোদশালায়। তাতে বেশ দুপয়সা আয় করে জাপানী মেয়েরাও (ঘাইশাগার্ল) আজ আর্থিক সচ্ছলতার অধিকারিণী। জাপানের ঐতিহ্যবাহী 'ঘাইশাগার্ল' এর স্থান দখল করে নিয়েছে হোটেল, মোটেলের এইসব আধুনিক পরিচারিকারা। নিজ বাড়ির একঘেয়ে জীবন যাত্রার বাইরে এসব নৈশ ক্লাবে নতুন নতুন সহচরীদের সংসর্গের লোভে প্রায় সর্বস্তরের বহু জাপানী এখানে এসে 'ওভারটাইম' বা বাড়তি আয়ের একটি অংশ খরচ করে বসে গিন্নীদের ভৎর্সনা সত্ত্বেও। এ-সব ক্লাবে পশ্চিমী কায়দায় টপলেস, বটমলেস, মিনিস্কার্ট পরিহিতা তরুণীরা খদ্দেরদের অধরে ঢেলে দেয় সুরাসুধা, আবার পাশে বসে সুখ দুঃখের কথা শোনে। একটু কাতুকুতু দিয়ে বা চিমটি কেটে, হাসি হুল্লোড়ের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য ডুবিয়ে দেয় তারা খদ্দেরদের। এ ভাবে বাইরে আনন্দ উপভোগ করে সাধারণত গভীর রাতেই ফেরে অনেক পুরুষেরা তাদের নিজ নিজ বাড়িতে। নৈশক্লাবের হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে তারা প্রায়ই ভুলে যায় যে বাড়িতে আর একজন তার বাচ্চাদের নিয়ে বিনিদ্র অবস্থায় অধীর আগ্রহে বসে আছে স্বামীর বাড়ি ফেরার আশায়।

পুরুষদের এই বহির্মুখী প্রবণতা রোধ করার উদ্দেশ্যে জাপানের গৃহিণীরাও আজ সমবেতভাবে নতুন এক আন্দোলন গড়ে তুলেছে

Mamun Academy

যার সংক্ষিপ্ত ইংরেজী নাম Q.R. H.বা Quickly Return Home. অর্থাৎ কাজ শেষে সব স্বামীদের তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে—নৈশ ক্লাবে বা মোটেলে যাওয়া চলবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি রোধ করতে পেরেছে স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের ঐসব ক্লাবে যাওয়া?

আবার বাইরে ঐসব নৈশ ক্লাবের যুবতীদের সঙ্গে অবাধ মেলা-মেশার কারণে জাপানের অনেক ঘর ভেঙে গেছে—অনেক পরিবারের বিবাহিত জীবন হয়েছে বিধ্বস্ত। কত ঘরে কত সোহাগী গুমরে গুমরে কেঁদেছে, যার অধিকাংশ কাহিনীই অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তবে মাঝে মাঝে দুএকটি ঘটনা সাংবাদিকদের কারণে সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েও পড়ে।

এমনি একটি হৃদয়বিদারক করুণ কাহিনী শেষে কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়, ১৯৭২ সালে।

এক আধুনিকা জাপানী তরুণী নাম কুমিকো আরাইও। বয়স ২৩ বৎসর। প্রেমের ক্ষেত্রে তাকে একেবারে নতুন বা অনভিজ্ঞা বলা চলে না। দেখতে মোটামুটি সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী। বেশ কিছুদিন ধরে সে কাজ করে যাচ্ছে টোকিওর এক নৈশ ক্লাবে পরিচারিকা হিসেবে।

প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত তাকে কাজ করতে হতো সেখানে। তার কাজের মধ্যে ছিল—খদ্দেরদের খাবার টেবিলে পৌঁছে দিয়ে তাদের পাশে বসে গল্পগুজব করে বা সিগ্রেট ধরিয়ে দিয়ে, ক্লাবে খদ্দেরদের ক্ষণিকের অবস্থানটুকু মধুর করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করা।

ঐ নৈশ ক্লাবে এক রাতে সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর এসে হাজির হলো এক মিল কর্মচারী—সুঠামদেহী যুবক সোকিয়া। সে-

Mamun Academy

রাতে কর্তব্যরত কুমিকো আরাইও এগিয়ে এলো সোকিয়াকে অভ্যর্থনা জানাতে অনেকটা গতানুগতিক ভাবেই যেমন সে আরও দশজনের ব্যাপারে করে আসছে গত দু'বছর ধরে।

সোকিয়াকে নিয়ে কুমিকো বসালো আধো আলোকিত হলঘরের এক কোণায় কিছুটা নির্জন জায়গায়। বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল সে-সময়। কুমিকো পরম যত্নভরে সোকিয়ার ওভারকোটটি খুলে নিয়ে তা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলো। তারপর মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলো, কি খাবার আনবো তোমার জন্য—চা, স্যাণ্ডউইচ, না আর কিছু? যে ঠাণ্ডা তাতে বোধহয় শ্যাম্পেনও দরকার হবে।'

ওর মিষ্টি চেহারা ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ সোকিয়া যেন উন্মনা হয়ে ওঠে। সে হেসে বললো—আপাততঃ স্যাণ্ডউইচ ও শ্যাম্পেন হলেই চলবে, তবে আর একটি জিনিসও অবশ্য চাই তা হলো তোমার সঙ্গ—তুমিই কিন্তু পাশে বসে খাওয়াবে আমাকে। 'আচ্ছা তাই হবে, খাবার তো আগে নিয়ে আসি!' এই বলে সোকিয়ার দিকে চটুল চাহনি হেনে একটু সামনে ঝুঁকে কুমিকো হাসিমুখে চলে গেল খাবার আনতে, অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ফিরে এলো ট্রে হাতে নিয়ে। হাত ধরে তাকে পাশে বসালো সোকিয়া। নানা গল্প ও হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে বহুক্ষণ কাটালো দুজন পাশাপাশি বসে। মাঝে মাঝে কুমিকো নিজেই সোকিয়ার অধরে শ্যাম্পেন ঢেলে দিচ্ছিল মধুর হেসে। এসব অবশ্য নৈশ ক্লাবের সাধারণ রীতি। কারো বিশেষ নজর এদিকে পড়বার কথা নয়। সেদিন বেশ রাত করেই সোকিয়া বাড়ি ফিরলো তৃপ্ত মন নিয়ে। যদিও সে তখন ছিল বিবাহিত ও দুই সন্তানের পিতা। তবু মন থেকে সে কুমিকোকে কিছুতেই মুছে ফেল-

Maman Academy

তে পারছিল না। অনেক ক্লাবে বহু মেয়ে সে দেখেছে। কিন্তু কুমি-কোর মতো আর একটিও তার চোখে পড়েনি। ভাবলো সে ঐ ক্লাবে আর যাবে না। তার স্ত্রী-সন্তান ঘরে আছে। অন্য মেয়ের প্রতি তার দুর্বলতা সাজে না।

এদিকে কিন্তু কুমিকোর অবস্থাও একই রকম। নৈশ ক্লাবে গত দুবৎসরের চাকুরী জীবনে সে বহু পুরুষের সংসর্গে এসেছে। কর্তব্যের টানে সে তাদের যথাসাধ্য সেবা করেছে। কিন্তু কেউ তো তার মনে বিশেষ দাগ কাটতে পারেনি কখনো! কিন্তু আজ এ কি হলো তার! কি এক সম্মোহনী শক্তি আছে সোকিয়ার, তাকে সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। শত চেষ্টা করেও। রাতে বাসায় ফিরে কুমিকো ভাবছে—কাল আবার আসবে তো সোকিয়া ক্লাবে? কিন্তু যদি না আসে? ভীষণ ভুল হয়ে গেছে ওর বাড়ির ঠিকানাটা না রেখে। সব আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতেই সে-রাতে ঘুমিয়ে পড়লো কুমিকো।

পরদিন কিন্তু সোকিয়ার নৈশ ক্লাবে আসবার কথা ছিল না। কারণ সাধারণত সে প্রতি শনিবারে সাপ্তাহিক বেতন নিয়ে একবারই মাত্র যেতো নৈশ ক্লাবে বা প্রমোদশালায়।

এবার কিন্তু পরদিনও কি এক দুর্বার আকর্ষণে সন্ধ্যার পর সে ঠিক এসে হাজির হলো সেই একই ক্লাবের দরজায়। সেখানে পৌঁছে তার উৎসুক চোখ খুঁজে বেড়াতে লাগলো একটি চেনা মুখ। বেশিক্ষণ খুঁজতে হলো না। কাছেই ছিল কুমিকো। সেও অধীর আগ্রহে ওর জন্যই অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ ধরে। এমনকি এর আগে আরো দুজন ধনী খদ্দেরের সঙ্গ দেবার আহ্বান কুমিকো কৌশলে এড়িয়ে গেছে। এতক্ষণে সোকিয়াকে দেখে কুমিকোও মুখ ভরা হাসি

নিয়ে ছুটে এলো তার কাছে।

'এসেছো তুমি তাহলে? কিন্তু এত দেরি করলে কেন? আজ তো ছুটির দিন।' এই বলে সোকিয়ার হাত ধরে কুমিকো এক প্রকার তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসালো একটি ছোট্ট কেবিনে।

মন দেয়ানেয়ার বহু কথা হলো সেদিন তাদের মধ্যে। দুজনেই দুজনের কাছে অকপটে স্বীকার করলো যে তারা এরই মধ্যে পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। তাদের মিলন না হলে উভয়ের জীবনই ব্যর্থ হবে। সোকিয়ার কোলে মাথা রেখে কুমিকো অকপটে বলে চলছিল তার মনের সব কথা। এতদিন পরে সে তার মনের মানুষকে পেয়েছে। তাকে বিয়ে করতে অনুরোধ করলো সে।

একথা শুনেই সোকিয়ার মুখ সহসা গম্ভীর হয়ে উঠলো। তা দেখে কুমিকো চমকে উঠে প্রশ্ন করলো:

—কি হয়েছে তোমার? হঠাৎ এরকম হয়ে উঠলে কেন?

—কিছু না—এমনিই,বলে সে আদর করে কুমিকোর মাথায় হাত বুলোতে লাগলো কিন্তু মুখ ফুটে সে তখন বলতে পারলো না আসল কথা যে, তার স্ত্রী ও দুটি সন্তান বর্তমান,আর এ অবস্থায় তাদের মধ্যে বিয়ে অসম্ভব।

পরদিন সন্ধ্যার পর উভয়ে আবার মিলিত হলো একটি পার্কে। পার্কের একটি নির্জন কুঞ্জবনের পাশে বসে কত কথাই বললো দুজন দুজনকে। মাঝে মাঝে নিবিড় আলিঙ্গনে একে অপরকে আপন করে নিল।

এভাবে প্রায় প্রতিদিনই তাদের সাক্ষাৎ হতো।

কোনো এক ছুটির দিনে তারা অবকাশ যাপনের জন্য চলে গেল

সমুদ্র সৈকতে। সারাদিন সমুদ্র তীরে ছুটাছুটি ও সমুদ্র স্নান করে রাতের বেলা তারা আশ্রয় নিল এক নিকটবর্তী হোটেলরুমে। সে-রাতেই সোকিয়া প্রথম বলতে বাধ্য হলো কুমিকোকে সেই চরম দুঃসংবাদ যে এত প্রেমের পরও তাদের মধ্যে বিয়ে সম্ভব নয়, কারণ তার ঘরে স্ত্রী-পুত্র রয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কুমিকো অনড় অচল। সে জানালো এখন তার আর ফিরে যাবার পথ নেই। সোকিয়াকে না পেলে সে আত্মহত্যা করবে।

এদিকে সোকিয়ার স্ত্রী মিচিকো টের পেল ব্যাপারটা। যদিও তার স্বামী ও কুমিকোর ভেতরের সম্পর্ক যে এতদূর গড়িয়েছে তা সে ততখানি আঁচ করতে পারেনি। সেই থেকে সে নানা ভাবে চেষ্টা করেছে তার স্বামীকে এই পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে। সে কিন্তু সত্যিই তার স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো, যেমন ভালোবাসতো সে ফুলের মতো সুন্দর তাদের দুই শিশু সন্তানকে। ওদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আরও ব্যাকুল হয়ে উঠলো মিচিকোর মাতৃহৃদয়।

এর মধ্যে অসুখে পড়ে সোকিয়া একনাগাড়ে তিনদিন শয্যা-শায়ী ছিল। ফলে এ সময় বাইরে বেরুনো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি আর কুমিকোর সঙ্গেও সে দেখা করতে পারেনি।

তৃতীয় দিনে কুমিকোই প্রথমবারের মতো এসে হাজির হলো সোকিয়ার বাড়িতে। শয্যাশায়ী সোকিয়ার কপালে হাত রেখেই আঁতকে উঠলো সে—'উঃ সারা শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে! এতদিন খবর দাওনি কেন আমাকে?'

এ সময়ে হঠাৎ তার খেয়াল হলো যে এ বাড়িতে সোকিয়ার স্ত্রীও আছে। মিচিকো ততক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এই প্রথম আলাপ পরিচয় হলো দুজনের মধ্যে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বার বার দেখ-

Mamun Academy

ছিল মিচিকো নতুন আগন্তুককে।

এরপরথেকে সোকিয়া পুরোপুরি সেরে না ওঠা পর্যন্ত প্রতিদিনই কুমিকো আসতো ওদের বাড়িতে নানা ফলমূল নিয়ে। মিচিকোর সঙ্গেও সে আলাপ করতো, আর বাচ্চা দুটিকে আদর করে ওদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করতো। স্বাভাবিক ভাবেই সোকিয়ার স্ত্রীর মোটেও ভালো লাগতো না তার স্বামী ও যুবতী কুমিকোর এত মাখামাখি, অন্তরঙ্গতা। সেও তো নারী? ওদের দুজনের চোখ-মুখের ভাষা থেকে সে তার ভবিষ্যৎ সাংসারিক ভাঙনের কথা চিন্তা করে শঙ্কায় কেঁপে উঠলো। এবার সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো কেন তার স্বামী গত কয়েক সপ্তাহ যাবত প্রায় প্রতিদিনই এতরাত করে বাড়ি ফিরতো, আর কারণ জিজ্ঞেস করলেই নানা অজুহাত দেখাতো।

অসুখ থেকে ভালো হয়ে উঠলে মিচিকো তার স্বামীকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলো যেন সে কুমিকোর মায়াজাল থেকে বেরিয়ে আসে। যার সংসার আছে, ঘরে স্ত্রী-পুত্র আছে, তার পক্ষে সাজে-না এভাবে এক কুমারী মেয়ের ফাঁদে পা দেয়া। মিচিকো তার স্বামীকে এও বুঝাতে চেষ্টা করলো যে ঐ ডাইনী মেয়ের কবলে পড়ে তার মান, মম্মান, স্ত্রী, পুত্র, সংসার সবই ছারখার হয়ে যাবে।

কিন্তু বৃথাই সব চেষ্টা। ভালো হয়ে সোকিয়া আবার সেই পুরোনো খেলায় মেতে উঠলো। কাজের সময়টুকু ছাড়া বাকি প্রায় সারাটা সময়ই সে কুমিকোর সঙ্গে কাটায়। দু'একদিন সোকিয়ার যেতে দেরি হলে কুমিকো নিজেই এসে হাজির হতো তার বাসায়, তারপরে দুজন একসঙ্গে বেরিয়ে পড়তো বাইরে। সোকিয়ার স্ত্রী ঝগড়াও করেছে কয়েকবার তার স্বামীর সঙ্গে তাদের এইসব বাড়াবাড়ির কারণে। এতে মাঝে মাঝে স্বামী কিছুদিন কুমিকোর

Mamun Academy

কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতো। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার আগের মতই চলতো। এসব দেখে মিচিকো শেষ পর্যন্ত নীরবে কেঁদেছে আর ধিক্কার দিয়েছে নিজের ভাগ্যকে। সে ভাবে সোকিয়ার তুলনায় তার শ্রীহীনতাই বুঝি প্রেমের রাজ্যে এই পরাজয়ের জন্য দায়ী, এবং সে-কারণেই বোধহয় সে তার স্বামীকে ধরে রাখতে পারছে না।

শেষ চেষ্টা হিসেবে অনেক চিন্তা করে মিচিকো অন্য এক পথ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নিল। সেদিন সে গোপনে খবর পাঠালো কুমিকো আরাইওকে একবার তার বাসায় আসতে কি এক জরুরী কাজে।

কুমিকো যখন সেখানে এলো তখন সোকিয়া বাসায় ছিল না। ওকে আদর করে মিচিকো পাশে বসালো। খাবার খাওয়ালো, বাচ্চা দুটিকেও কাছে নিয়ে এলো। কুমিকো ওদের কোলে নিয়ে আদর করলো। এবার কাজের কথা পাড়লো মিচিকো। সে এগিয়ে এসে কুমিকোর হাত দুটি জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে বললো, 'বোন তোমার কাছে আজ আমি একটি জিনিস ভিক্ষা চাচ্ছি। বলো, আমাকে নিরাশ করবে না—ফিরিয়ে দেবে না আমাকে?'

হঠাৎ এরকম পরিবেশের জন্য প্রস্তুত ছিল না কুমিকো। সে কিছুটা আশ্চর্য হয়ে বললো—'কি-ই বা আছে আমার যা তোমাকে দিতে পারি, বোন। আমি যে এক হতভাগ্য নিঃস্ব মেয়ে।'

'তুমিই পারো-বোন, একমাত্র তুমিই পারো আমাকে এই চরম বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। তুমিই কেবল মেটাতে পারো আমার শেষ চাহিদা। বিনিময়ে তুমি যা চাইবে আমি তাই দেবো তোমাকে। লক্ষ্মী বোন আমার, তুমি শুধু আমাকে আমার স্বামী ভিক্ষা দাও। ফিরিয়ে দাও আমার স্বামীকে তার স্ত্রী-পুত্রদের কাছে।

Mamun Academy

আমার স্বামীর মনের অবস্থা আমি জানি। এখন এ বিপদ থেকে একমাত্র তুমিই আমাদের উদ্ধার করতে পারো।'

শুনে আঁতকে ওঠে কুমিকো। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে সে বলে—'বড় দেরি হয়ে গেছে বোন—বড় দেরি হয়ে গেছে। এখন আর উপায় নেই। অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছি আমরা, সেখান থেকে তো আর ফেরার পথ নেই। এখন সোকিয়াই যে আমার প্রাণ—সোকিয়াই আমার জীবন-স্পন্দন। আমার অবস্থায় পড়ে কোনো মেয়ে কি পারে স্বেচ্ছায় ভালবাসা বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকতে? তা হয় না—তা হয় না।' বলে দু'হাতে মুখ ঢাকে কুমিকো।

কাতর কণ্ঠে আবার মিচিকো বলে—'আমি না হয় দোষ করেছি, স্বামীকে ধরে রাখতে পারিনি। কিন্তু নিষ্পাপ এই সন্তান দুটি কি দোষ করেছে? কি অধিকার আছে তোমার-তাদের বাবাকে এভাবে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার? অন্তত ওদের কচি মুখের দিকে চেয়ে তুমি ভিক্ষা দাও আমাদের, তুমি রাজি হয়ে যাও কুমিকো—ভগবান তোমার ভালো করবেন।' বলতে বলতে কেঁদে ওকে দু'হাতে আবার জড়িয়ে ধরে মিচিকো, একটু থেমে আবার সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'তুমি গোপনে বিদেশে চলে যাও। আমি আমার সঞ্চিত সমস্ত টাকা পয়সা তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। বিদেশে তোমার সমস্ত খরচ আমি যোগাবো। তা না হলে তুমি দেশের অন্যত্র দূরে কোথাও চলে যাও। তারও সব খরচ আমি দেবো। মাত্র কয়েক মাস তুমি দূরে সরে থাকলে আমি আবার চেষ্টা করে দেখি স্বামীর মন ফেরাতে পারি কিনা। তুমি কুমারী, সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে। তোমার স্বামীর অভাব হবে না। সোকিয়ার চেয়ে অনেক ভালো বর তোমার জুটে যাবে। আর ভেবে দেখ আমার কথা—বর্তমান অব-

Mamun Academy

স্থায় স্বামী ছাড়া আর কি নিয়ে আমি বাঁচতে পারি। বাবা ছাড়া কিভাবে মানুষ করতে পারি নাবালক এই সন্তান দুটিকে।

কিন্তু বৃথা হলো সব চেষ্টা। কুমিকোর মন গললো না, সে শুধু বললো—'সোকিয়াকে ছাড়া আমিও বাঁচতে পারবো না। আমাকে তাহলে আত্মহত্যা করতে হবে। কেবল এটা ছাড়া তোমার আর যে কোনো কথা আমি মানতে রাজি আছি। এ ব্যাপারে আমাকে তুমি ক্ষমা করো।'

এটুকু বলে রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সেদিন কুমিকো আরাইও।

এ-ঘটনার পর থেকে কুমিকো যেন আরো বেপরোয়া হয়ে উঠলো। মিচিকোর সঙ্গে অনেকটা প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়েই যেন সে আরো গভীরভাবে মিশতে শুরু করলো তার প্রেমিকের সঙ্গে। অবশ্য প্রেমের এই প্রতিযোগিতায় মিচিকো অনেক আগেই পরাজয় বরণ করে নিয়েছে। এখন সে শুধু নামে মাত্র সোকিয়ার স্ত্রী। আসলে ইতিমধ্যে তার স্বামীর মনপ্রাণ সবটুকুই দখল করে নিয়েছে কুমিকো। স্ত্রীর এর চেয়ে বড় পরাজয় আর কি হতে পারে! তবুও সে হাল ছেড়ে দেয়নি। কারণ সে এটা জানে যে দেশের আইন অনুযায়ী বিবাহিত স্ত্রী রাজি না হলে কুমিকোর ঐ অবৈধ প্রেম কোনদিন সমাজ বা ধর্মীয় স্বীকৃতি পাবে না। আর স্ত্রী বর্তমান থাকতে আইনতঃ তার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। ধর্মপরায়ণা মিচিকো এখনো আশায় বুক বেঁধে আছে যে ভগবান বুদ্ধ একদিন মুখ তুলে চাইবেন, আর কুমিকোও পাবে তার পাপের শাস্তি। কিন্তু তখনো সে আঁচ করতে পারেনি, ঐ শাস্তি আসবে কি চরম পরিণতি নিয়ে, যার বহ্নিতে সবাই পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

চতুর কুমিকোও বুঝতে পেরেছিল তাদের প্রেমের অন্তর্নিহিত অসুবিধা হলো—সোকিয়া বিবাহিত ও তার স্ত্রী বর্তমান। আর মিচিকোও স্বামী ত্যাগ করতে রাজি নয়। এক্ষেত্রে সোকিয়ার পক্ষে তাকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। তাই তাদের এ প্রেম অবৈধ। তাদের সন্তান হবে জারজ।

এসব কথা চিন্তা করে কুমিকো পাগলের মতো হয়ে যায়। কিন্তু তবুও সে সোকিয়াকে ছেড়ে থাকতে পারে না। নিজেকে সোকিয়ার পদতলে অর্পণ করে তার নারী জীবন হয়েছে পরিপূর্ণ—সে হয়েছে ধন্য। এ মোহ থেকে তার মুক্তি নেই, সে তা পরিষ্কার বুঝতে পারে।

সেদিন ছিল শীতকালের এক গুমোট রাত। বেশ পয়সা খরচ করে কুমিকো ও সোকিয়া টোকিওর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হোটেলের একটি রুম ভাড়া নিয়েছে সে-রাতের জন্য। ভেবেছিল বাইরের গুমোট গরমের হাত থেকে ঐ সুশীতল সুসজ্জিত কক্ষে একান্তে কাছাকাছি থেকে উপভোগ করবে ওরা দুজনে।

হোটেলের ঐ কামরায় উভয়ে পরিপূর্ণভাবে উভয়ের সঙ্গলাভ করে পরিতৃপ্ত হলো। রাতে একসময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সোকিয়া হোটেলের নরম বিছানায়। কুমিকোর চোখে কিন্তু ঘুম নেই। গভীর ঘুমে নিমগ্ন সোকিয়াকে সে আদর করে ভালো ভাবে শুইয়ে দিল। পরিতৃপ্ত হৃদয়ে সে ঘুমন্ত সোকিয়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকে কতক্ষণ। এভাবে আর কতদিন সে প্রেম নিয়ে লুকোচুরি খেলবে তার সঙ্গে? ওকে সত্যিকার স্বামী হিসেবে পাবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে সে। একে মিচিকোর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয়া বা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া তার কাছে এখন অসহ্য মনে হয়।

হঠাৎ একটি মতলব তার মনে খেলে গেল। এই রাতেই এর

একটা বিহিত করবে বলে সে মনস্থির করে ফেললো—যত বিপদই আসুক, তাতে সে পরোয়া করবে না।

সোকিয়াকে গভীর নিদ্রামগ্ন দেখে কুমিকো হোটেলের কামরায় দরজা ভিড়িয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে এলো রাস্তায়, একা।

সোজা চলে এলো সে সোকিয়ার বাসায়। দরজায় কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো মিচিকো। এতরাতে কুমিকোকে এখানে দেখে আশ্চর্য হলো মিচিকো। তার স্বামী সে রাতে বাসায় ফেরেনি, সুতরাং সে ধরে নিয়েছিল কুমিকোর সঙ্গেই সে-রাত কাটাচ্ছে। স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করতেই কুমিকো জানালো যে তার খোঁজেই সে এখানে এসেছে। ওর স্বামী বাসায় নেই শুনে কুমিকো কপট বিস্ময়ের ভাব দেখালো।

মিচিকো শুনে একটু প্রাশ্বস্ত হলো এই ভেবে যে বোধহয় ওর স্বামী বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কোথাও আটকে আছে। এ রাতে যে সে কুমিকোর পাল্লায় পড়েনি, এতেই সে খুশি হলো মনে মনে। কুমিকো খোঁজ নিয়ে জানলো বাচ্চা দুটি পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে।

এরপর বেডরুমে বসে অনেক কথা হলো তাদের মধ্যে। দুজনেই চায় মুক্তির পথ। দুজনেই দুজনকে অনেক অনুরোধ-অনুনয় করলো এই প্রেমের পথ থেকে একে অপরকে সরে দাঁড়াতে। অবশেষে কুমিকোই রাজি হয়ে মিচিকোকে আশ্বাস দিল যে ওদের স্বামী, স্ত্রী, পুত্রের সুন্দর সংসার সে ভাঙবে না। সে নিজেই সরে দাঁড়াবে ওদের পথ থেকে।

কুমিকোর মুখে আজ এ কথা শুনে সহজে বিশ্বাস হতে চায় না মিচিকোর—'ভূতের মুখে কি রাম-নাম শুনছে সে আজ?' আনন্দে সে কুমিকোর গলা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সরল মনে

Mamun Academy

কুমিকোর কথা বিশ্বাস করে সে ভাবে আজ তার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই।

ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ক্লান্ত মিচিকো এক সময় বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

ওর বিছানার পাশে বসে কুমিকোর চোখে কিন্তু ঘুম নেই। এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা সে করছিল এতক্ষণ। আজ সে এক মারাত্মক খেলা খেলবে। প্রেমের কাঁটা দূর করতে নারী যে কত নিষ্ঠুর ও হিংস্র হতে পারে, তার এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি হয়ে দেখা দিল আজ কুমিকো।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো সে। এবার চেয়ে দেখলো তার সামনেই বিছানায় গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে শুয়ে আছে তার প্রেমের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। এ রকম সুযোগ আর আসবে না। আর দেরি করা যায় না। কুমিকোর মাথায় খুন চেপে গেল।

হঠাৎ সে এগিয়ে এসে ঘুমন্ত মিচিকোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণপণ শক্তিতে দু'হাতে তার গলা চেপে ধরলো। জোরে আরো জোরে সে ক্রমাগত টিপতে থাকলো তার গলা। একবার মাত্র অল্প শব্দ বেরুলো মিচিকোর মুখ দিয়ে। প্রাণপণে সে হাত-পা ছোঁড়া-ছুঁড়ি করলো মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার পাবার নিষ্ফল চেষ্টায়। কিন্তু আরও জোরে ওর গলা চাপতে কুমিকো ওর বুকের উপর উঠে বসলো। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়লো মিচিকো। ব্যাস, তারপর সব চুপচাপ। সেদিনের সেই ঘুম আর ভাঙেনি তার কোনদিন। চিরদিনের মতো সে সরে দাঁড়ালো সোকিয়া ও কুমিকোর মাঝ থেকে।

যখন কুমিকো দেখলো যে সত্যিই মিচিকো মারা গেছে তখন

সে উঠে দাঁড়ালো। ঘামে তার শরীর ভিজে গেছে। এবার মৃত-দেহটি নিয়ে কি করা যায়? কিভাবে এই হত্যাকাণ্ড গোপন করা যায়,সেই চিন্তাই এখন সে করতে লাগলো, আবার এক বুদ্ধি এলো তার মাথায়।

মিচিকোর বেড কভারটি ছিঁড়ে নিয়ে তার এক মাথাসে ঐ ঘরের ক্যানের রডের সঙ্গে বেঁধে, অন্য প্রান্ত লাশের গলার সঙ্গে বেঁধে তা ঝুলিয়ে রাখলো শূন্যে, যাতে মনে হয় মিচিকো গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ঐ কাজ সমাধা করে কুমিকো আবার ফিরে এলো হোটেলে। রুমে ঢুকে দেখলো তখনো সোকিয়া ঘুমোচ্ছে অঘোরে। কুমিকো এসে তার পাশে আশ্রয় নিল। ভাবলো এবার তার পথের কাঁটা দূর হয়েছে। এখন সে একান্তভাবে পাবে সোকিয়াকে।

পরদিন সকালে পুলিশ এসে সোকিয়ার স্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনাকে প্রথমে একটি সাধারণ আত্মহত্যার কেস বলেই ধরে নিয়েছিল। তা-ছাড়া তার আত্মহত্যা করার প্রচুর কারণও ছিল, ওর বিপথগামী স্বামীর কথা আশেপাশের সবাই জানতো। আর সেই কারণে মিচি-কোর মানসিক অশান্তি ও স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া বিবা-দের কথাও প্রতিবেশীরা জানতো। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর পক্ষে আত্মহত্যার প্রবণতা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু লাশ নামিয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা করতেই পুলিশের নজরে এলো মৃতের গলায় আঙুলের গভীর চাপের দাগ। লাশ ময়না-তদন্ত করে ডাক্তার অভিমত দিল যে, এটা আত্মহত্যা নয় বরং গলা টিপে তাকে নৃশংসভাবে আগে হত্যা করা হয়েছে। তারপর তার লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

Mamun Academy

সন্দেহের বশে পুলিশ মিচিকোর স্বামী ও কুমিকো উভয়কেই গ্রেফতার করলো। প্রথম দিকে কুমিকো নিজেকে নির্দোষ বলে চালাবার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত যখন দেখলো যে তার প্রেমিক নির্দোষ সোকিয়াও জড়িয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে এই খুনের দায়ে তখন সে সব কথা পুলিশের কাছে স্বীকার করে অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়লো।

প্রেমকে সে জীবনের চেয়েও বড় ভেবেছিল। তাই শেষ পর্যায়ে সে আগাগোড়া সব ঘটনার স্বীকারোক্তি করে তার প্রেমিককে মুক্তি দিল খুনের মিথ্যা দায় থেকে। কিন্তু পরিণামে সে পেল কি? সোকিয়ার নিষ্পাপ স্ত্রী প্রাণ দিয়ে তাকে দিয়ে গেল এক চরম শিক্ষা। কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে।

জাপানের এই চাঞ্চল্যকর মামলায় খুনের অপরাধে আদালতে কুমিকোর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হলো। আর সেখানকার সাংবাদিকেরা ফলাও করে প্রকাশ করলো এই বিচার কাহিনী বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়।

Mamun Academy

ধর্ম বনাম বিজ্ঞান

আমেরিকার ছোট শহর ভেটনে ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত এই অভিনব মামলাটি শুধু আমেরিকাতেই নয়, ইউরোপেরও সর্বত্র বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল।

এই মামলার আসামী ছিলেন তৎকালীন ভেটন হাই স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক মিঃ জন টি. স্কোপস। ভিন্ন প্রদেশের বাসিন্দা মিঃ জন মাত্র অল্প কিছুদিন আগে যোগ দিয়েছিলেন ঐ স্কুলে প্রধানত বিজ্ঞানের শিক্ষকরূপে। তিনি একজন ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। স্কুলে তিনি ফুটবলের কোচ হিসেবেও কাজ করতেন। নিজে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী হলেও ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে ছিলেন তিনি।

সে-যুগে আমেরিকার সর্বত্র এক দ্বন্দ্ব চলছিল গোঁড়া ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে আধুনিক বা প্রগতিশীল মতাবলম্বীদের। সে-লড়াইকে আরও তীব্র করে তুললো বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের বিখ্যাত বিবর্তনতত্ত্ব (Darwin's Theory of Evolution)। ডারউইনের মতে, মানুষসহ পৃথিবীর সব জীবিত প্রাণী একই আদিম পূর্বপুরুষের বংশধর। এবং তাঁর মতে, বর্তমান মানুষের পূর্বপুরুষ ছিল বানর। লক্ষ লক্ষ বৎসরের ক্রমবিবর্তনের ফলেই বানর থেকে ক্রমশ উন্নত হয়ে মানব জাতি তার বর্তমান সভ্যরূপ ধারণ করেছে। তবে এখনো

Mamun Academy

মানুষের মধ্যে সেই আদিম পশুপ্রবৃত্তি সুপ্তভাবে বিরাজমান। আর মাঝে মাঝে সেই পাশবিকতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে,যার ফলে মানুষ তখন পশুর মতো বা তার চেয়েও অধম প্রকৃতির কাজ করে বসে।

সে সময়কার সনাতনী খ্রীষ্টানেরা কিন্তু মানব সৃষ্টির এই উদ্ভট থিওরী শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। তাদের মতে পৃথিবীতে কিভাবে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে তা তো ঈশ্বর প্রদত্ত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেলেই পরিষ্কারভাবে বলা আছে। অর্থাৎ আদম ও ইভ্ থেকেই মানব জাতির জন্ম। তাদের মতে, বাইবেলের বাণী কখনো মিথ্যা হতে পারে না। এ সনাতনপন্থীরা ডারউইনের থিওরীকে 'উদ্ভট মস্তিষ্কের অলীক কল্পনা' বলে আখ্যা দেয়। ডারউইন ও তার সহযোগীদের এরা বিধর্মী, পাপী বলে অভিহিত করে প্রচার করলো যে, ভগবান ও যীশু খ্রীষ্টের বাণীর বিরুদ্ধাচরণ করায় এদের একমাত্র স্থান হবে নরকে।

ক্ষুদ্র শহর ডেটনেও কয়েক বছর যাবত সনাতনী ও আধুনিক (Fundamentalists and modernist) এই দু'দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। মাঝে মাঝে সেই বিরোধ আবার উগ্রপন্থীদের কল্যাণে চরমে উঠে যেতো। সনাতনীরা ওল্ডটেস্টামেন্ট বা বাইবেলের প্রতিটি বাণী অভ্রান্ত বলে ধরে নিতো। অপর পক্ষে আধুনিক মতবাদীরা ডারউইন প্রবর্তিত জীব বিজ্ঞানের নতুন থিওরী—অর্থাৎ প্রাণী জগতের ক্রমবিবর্তনে বিশ্বাস করতো।

ডেটন শহর ছিল টেনেসী রাজ্যের অন্তর্গত। সেখানে কিন্তু সনাতনী মতাবলম্বীদেরই প্রাধান্য ছিল। সেই রাজ্যের আইন সভায় সনাতনীদের উৎসাহে একটি বিল পাশ করিয়ে নেয়া হয় যার বিধান মতে পবিত্র বাইবেলে মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা আছে

Mamun Academy

তার বিপরীত কোনো থিওরীর প্রচার বা প্রশিক্ষণ বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়। এই সময় এহেন একটি কড়া আইন পাশ করার সুস্পষ্ট কারণ হচ্ছে, আধুনিক মতাবলম্বীদের দ্বারা ডারউইনের থিওরী সাধারণের মধ্যে প্রচার বন্ধ করা।

সেদিন জর্জ র‍্যাপিলিয়া নামক ভেটনের এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ার রবসনের ওষুধের দোকানে বসে আড্ডা মারছিল। সেখানে আরও কয়েকজন স্থানীয় লোক জড়ো হয়েছিল। কথায় কথায় আধুনিক শিক্ষিত র‍্যাপিলিয়া সদ্য পাস করা স্থানীয় ঐ আইনের সমালোচনা করে বললো, এই আইন বজায় থাকলে এ রাজ্যের স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান, বিশেষ করে জীব বিজ্ঞান পড়া বন্ধ করে দিতে হবে। আর জীব বিজ্ঞান না পড়লে ডাক্তারীও পড়া যাবে না। ফলে এ-রাজ্যে আর নতুন ডাক্তার তৈরি হবে না।

ঐ ওষুধের দোকানের মালিক রবসন কিন্তু ছিল একজন গোঁড়া সনাতনী এবং নতুন আইনের সমর্থক। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'আধুনিক শিক্ষা পেয়ে তোমাদের মাথা বিগড়ে গেছে। তাই এখন পবিত্র ধর্মেরও বিরুদ্ধাচরণ করছো তোমরা। কি কাজে লাগবে তোমাদের ঐ উদ্ভট ডারউইনের থিওরী?'

র‍্যাপিলিয়া বললো, 'দেখো, বায়োলজি বা জীব বিজ্ঞান পড়তে হলে অবশ্যই জীবের এই ক্রম বিবর্তনের কাহিনীও পড়াতে ও পড়তে হবে। আর সেই সঙ্গে সাড়া জাগানো ডারউইনের তত্ত্বও অবশ্যই পড়তে হবে। সেটা বন্ধ করলে জ্ঞানের দুয়ারও জোর করে রুদ্ধ করে দেয়া হবে। তাছাড়া বায়োলজি না পড়লে ডাক্তারীও পড়া যাবে না।'

তখন রবসন রেগে গিয়ে বললো, 'কি বললে? জীবের বিবর্তনের গল্প না পড়লে বায়োলজি পড়া হবে না? এ তোমার একেবারেই

খোঁড়া যুক্তি।'

'নিশ্চয়ই না। আমি যেটা বলছি—সেটাই ঠিক,' দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দেয় র‍্যাপিলিয়া।

এদের দু'জনের কার কথা ঠিক তাই নিয়ে শুরু হলো তুমুল তর্ক। শেষে ঠিক হলো, স্থানীয় স্কুলের সদ্য-আগত বিজ্ঞান শিক্ষক জন টি. স্কোপস-এর অভিমত নেয়া হবে এ ব্যাপারে।

ডাক পড়লো জন স্কোপস-এর। কাছেই থাকতেন তিনি।

সব শুনে জন বললেন, 'র‍্যাপিলিয়ার অভিমতই সত্য। বায়োলজি পড়তে হলে জীবের ক্রমবিবর্তন তত্ত্বও অবশ্যই পড়াতে হবে।'

এ কথা শুনে রেগে গিয়ে রবসন বলে উঠলো, 'তাহলে আপনিও স্কুলের ছেলেদের ধর্মবিরোধী ঐ বিজ্ঞান পড়িয়ে দেশের আইন ভঙ্গ করছেন।'

জন শান্তভাবে বললেন, 'তাই যদি হয় তবে অন্যান্য বিজ্ঞান শিক্ষকরাও একইভাবে আইন ভঙ্গ করছেন। হাণ্টারের লেখা 'সিভিক বায়োলজি' সব স্কুলের একটি অনুমোদিত টেক্সট বই। সেই বইয়ে জীব জগতের ক্রমবিবর্তনের কাহিনী বিশদভাবে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা আছে। শিক্ষক হিসেবে সে-বই অবশ্যই আমাদের পড়াতে হয়। তাতে যদি দেশের আইন ভঙ্গ করা হয়, তবে বলতে পারেন আমিও সে দোষে দোষী।'

এমন সময় র‍্যাপিলিয়া হঠাৎ বলে উঠলো, 'আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয়? চলুন না এই বিরোধটির ফয়সালার জন্য আমরা কোর্টের আশ্রয় নিই। তাহলে দেশের আইন-আদালতই বিচার করে বলে দেবে কোন্‌টা আইনসিদ্ধ, আর কোন্‌টাই বা বেআইনী।'

সেখানে উপস্থিত সবাই সাগ্রহে রাজি হয়ে গেল এ-প্রস্তাবে।

Mamun Academy

'তাহলে শিক্ষক জন স্কোপসকেই হতে হয় এই মামলার আসামী।' বলে র‍্যাপিলিয়া।

ঝোঁকের মাথায় জন স্কোপস্ সম্মতি দিয়ে বলে উঠলেন,—'আমি রাজি।'

অতঃপর ঠিক হলো, এই মর্মে স্থানীয় কোর্টে একটা মামলা দায়ের করতে হবে জন স্কোপস-এর বিরুদ্ধে যে, তাঁর স্কুলের ছাত্রদের তিনি ধর্মবিরোধী ডারউইনের থিওরী পড়িয়ে দেশের আইন ভঙ্গ করছেন।

১৯২৫ সালের ৭ই মে তারিখে যখন মামলাটি কোর্টে রুজু করা হলো তখন কিন্তু এরা কেউ, এমন কি জন স্কোপসও চিন্তা করতে পারেননি যে ক্ষুদ্র এই ব্যাপার নিয়ে মামলাটি শেষ পর্যন্ত আমেরিকার ইতিহাসের অন্যতম বিখ্যাত একটি কেস হয়ে দাঁড়াবে, আর দেশে বিদেশে তা এত বিপুলভাবে প্রচারিত হয়ে সাড়া জাগাবে!

আমেরিকার তৎকালীন সংস্থা 'নাগরিক স্বাধীনতা ইউনিয়ন' (Civil Liberties Union) যেচে এসে ঘোষণা করলো যে, একজন শিক্ষকের সত্য বলার ও সত্য শিক্ষা দেবার অধিকার অবশ্যই আছে। এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তারা এই কেসে জন স্কোপস্-এর পক্ষ সমর্থন করবে ও প্রয়োজন হলে মামলাটি তারা আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে লড়বে।

বিপক্ষও বসে নেই। আরও জোরালোভাবে কোমর বাঁধলো তারা এই আইনের লড়াইয়ে। উইলিয়াম ব্রাইন ছিলেন তৎকালীন আমেরিকার একজন প্রখ্যাত নেতা, আইনজ্ঞ ও অসাধারণ বাগ্মী। তিনি তিন-তিনবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দলের পক্ষ থেকে নমিনেশন লাভ করেন। তাছাড়া সমগ্র আমেরিকার সনাতনী আন্দোলনের তিনিই ছিলেন নেতা। সেই উইলিয়াম ব্রাইন

স্বেচ্ছায় এই মামলায় বাদীপক্ষ সমর্থন করবেন বলে ঘোষণা করলেন। তিনি বইপত্র নিয়ে যথাসময়ে ভেটনে চলে এলেন বাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী হিসাবে এই মামলা পরিচালনার জন্য। গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক ব্রাইন বাইবেলেরও একজন অথরিটি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

অন্যদিকে আসামীপক্ষ সমর্থনেও স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন দেশের বিখ্যাত ফৌজদারী আইনজীবী মিঃ ক্লারেন্স ড্যারো। অথচ এই মামলার আসামী স্কোপস কোনদিন তাঁর কাছে যাননি বা তাঁকে দেখেনওনি।

শেষ পর্যন্ত ১০ই জুলাই গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিনে এই মামলার বিচার শুরু হলো। মাত্র দেড় হাজার নাগরিক অধ্যুষিত ছোট্ট একটি শহর ছিল তখন ডেটন। কিন্তু এই মামলা শুরু হবার আগে থেকেই এই ক্ষুদ্র শহরটির রূপ পাল্টাতে আরম্ভ করলো। আশেপাশের গ্রাম ও শহর থেকে বহু লোক এসে জমা হলো ঐ ছোট্ট শহরে। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল সনাতনীদের সমর্থক। তারা বহিরাগত বিধর্মীদের অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দেখতে ও কৌঁসুলী মিঃ ব্রাইনকে উৎসাহ দিতেই কোর্টে ভিড় করলো। শহরের রাস্তার পাশের দোকানগুলি সুন্দর করে সাজানো হলো নানা ধরনের পতাকা ও রঙ্গচিত্র দিয়ে। কোর্টের আশেপাশে রাতারাতি বসে গেল বহু স্টল ও দোকান। দু'পয়সা কামাই করার লোভে ঝুড়ি ঝুড়ি তরমুজের দোকান বসলো ঐ প্রচণ্ড গরমে লোকের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। বইয়ের স্টলগুলিতে বাইবেল ও ধর্মীয় বই বিক্রি হতে লাগলো গরম কেকের মতো।

আইন সভার সদস্য ৪৯ বৎসর বয়স্ক ডাবলিউ বাটলারও

Mamun Academy

এসে গেলেন ঐ শহরে। তাঁরই অবিরাম প্রচেষ্টায় বিবর্তনবাদ বিরোধী আইনটি পাস হয়েছিল রাজ্যসভায়, যে আইনের বলেই এখন জন স্কোপসকে আসামী হিসেবে হাজির করা হয়েছে এখানকার কোর্টে।

এই মামলার বিচারক ছিলেন জন টি. রাউলস্টন। একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। আটজন জুরীর সাহায্যে তিনি এই বিচারকার্য পরিচালনা করেন। জুরি নির্বাচনের পর দেখা গেল আটজনের মধ্যে তিনজনই জীবনে বাইবেল ছাড়া আর কোনো বই পড়েননি। আর একজন তো স্বীকার করলেন যে তিনি লেখাপড়াই জানেন না। এ কথা শুনে আসামীর পিতা (যিনি তাঁর বাড়ি কেনটাকি থেকে এতদূর পথ অতিক্রম করে এসেছেন তাঁর পুত্রের বিচার দেখতে) বলে উঠলেন, 'হায়, কি নারকীয় এক জুরীর সামনে উপস্থিত করা হয়েছে আমার ছেলেকে বিচারের জন্য।'

বিচারকক্ষে বাদীপক্ষের টেবিল দখল করে বসে আছেন স্বনামধন্য বৃদ্ধ ব্রাইন। মাথায় বিরাট টাক। মুখে কিন্তু হাসি লেগেই আছে। তাঁর হাতে একটি তালের পাখা, তা দিয়ে তিনি বাতাস নিচ্ছেন। উদীয়মান আইনজীবী তাঁর পুত্রও আছে তাঁর পাশে। এছাড়া তাঁর সঙ্গে আছেন টেনেসীর খ্যাতনামা এটর্নি জেনারেল টম স্টুয়ার্ড।

অপরদিকে আসামী পক্ষে আছেন ৬৮ বৎসর বয়স্ক সূচ্যগ্র-বুদ্ধিসম্পন্ন বিখ্যাত উকিল ক্লারেন্স ড্যারো। তাঁকে সাহায্য করছেন সুপুরুষ মেধাবী উকিল ডাডলী মেলন ও আর্থার গারফিল্ড।

বিচারের শুরুতে ধীর পদক্ষেপে শিক্ষক জন স্কোপস্ যখন আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন তখন লোক ঠাসা কোর্টরুম মৃদু গুঞ্জনে

Mamun Academy

ভরে উঠলো। বিজ্ঞ জজ যখন সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছিলেন, সেই ফাঁকে প্রধান উকিল ড্যারো আসামীর গম্ভীর মুখের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। তিনি স্নেহভরে তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'তুমি মোটেই চিন্তা করো না বৎস, আমি ওদের সময় মতো এমন কয়েকটি খেলা দেখাবো যে তাতেই বাজিমাত হয়ে যাবে।'

এই সঙ্গে আরও বলা দরকার যে, এই জুরী মামলার ধারা বিবরণী প্রচার করার জন্য আমেরিকার ইতিহাসে এবারই সর্বপ্রথম রেডিয়োর তরফ থেকে ঘোষকেরা তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে হাজির হয়েছে এখানে। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছে একশোরও বেশি সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ। মামলা চলাকালে বিশেষভাবে নিযুক্ত বিশজন টেলিগ্রাফ কর্মচারী প্রতিদিন সাংবাদিকদের দেয়া ১৬৫০০০ শব্দ টেলিগ্রাফ করে মামলার বিবরণী পৃথিবীর সর্বত্র পাঠাতো। এই কেসে আসামীর পক্ষে সাক্ষী দেবার জন্য এসেছেন হারভার্ড কলেজের বিখ্যাত প্রফেসর কার্টলী ম্যাথারের নেতৃত্বে একডজন নাম করা প্রফেসর ও বৈজ্ঞানিক।

বিচারের গোড়াতেই জজ রাউলস্‌টনের আহ্বানে একজন ধর্মযাজকের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বিচারকার্য শুরু হলো।

প্রথমে বাদীপক্ষ থেকে সংক্ষেপে মামলার বক্তব্য পেশের পর আসামী পক্ষের মিঃ ড্যারো উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, 'আমার বন্ধুবর এটর্নী জেনারেল তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেছেন যে, আসামী জন স্কোপস নিজেই ভালোভাবে জানেন, কি অপরাধে তাঁকে আজ এখানে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। আমিও জানি কি জন্য জন স্কোপস আজ এখানে এসেছেন। অজ্ঞতা ও ধর্মান্ধতায় আজ দেশ

ছেয়ে গেছে। এই দুই দুষ্ট গ্রহ একত্রিত হয়ে এখানে এক বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আর আজ এর শিকার হয়েছেন সরকারী স্কুলের একজন নামকরা শিক্ষক, কাল হবেন বেসরকারী শিক্ষকেরা, তারপর আসবে পত্রপত্রিকার পালা, পরে পুস্তকাদি ও শেষে খবরের কাগজগুলিকেও রেহাই দেয়া হবে না এই অজ্ঞতার ড্রাগনের করাল গ্রাস থেকে। আর এর কিছুদিন পরে মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হবে, কৃষ্টিতে কৃষ্টিতে সংঘর্ষ বাধানো হবে। শেষ পর্যন্ত আমরা প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিপাকে জড়িয়ে আবার বিচ্ছিন্নপানে ছুটে চলবো যতক্ষণ না আমরা আবার সেই তথাকথিত গৌরবময় যুগ ষোড়শ শতাব্দীতে ফিরে যাই—যে যুগে ধর্মান্ধ লোকেরা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত রাখতো। সেই সব লোকদের পুড়িয়ে মারতো যাঁরা চেষ্টা করতেন মানুষের মাঝে বিকশিত করতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৃষ্টি, ও যুক্তিতর্কের আলোকশিখা!'

ড্যারো থামতেই দর্শকদের মধ্য থেকে ক্রুদ্ধ এক ভদ্রমহিলা বলে উঠলো, 'নাস্তিক ঐ উকিলের স্থান নিশ্চয় নরকেই হবে।'

মিঃ ব্রাইন কিন্তু মুখ গম্ভীর করে বসে বসে তাঁর তালের পাখা দিয়ে বাতাস নিতে লাগলেন।

পরদিন বাদীপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হলো।

প্রথমেই দু'জন ছাত্রকে সাক্ষীর জন্য কাঠগড়ায় হাজির করা হলো, তারা সাক্ষ্যে বললো যে, আসামী তাদের শিক্ষক ও তিনি ক্লাসে তাদের ইভোলিউশন থিওরী পড়িয়েছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে তারা জেরায় এ-ও স্বীকার করলো যে, সে-কারণে কিন্তু তারা ধর্মের পথ থেকে সরে যায়নি।

হাওয়ার্ড মরগ্যান নামক ১৪ বৎসরের একজন মেধাবী ছাত্র

সাক্ষ্য দিয়ে বললো যে, আসামী তাদের শিখিয়েছেন মানুষ ও স্তন্যপায়ী গরু, ঘোড়া, কুকুর, বিড়ালের মতোই এক প্রকার জীব।'

'তিনি কি আরও বলেননি যে বিড়ালও মানুষের মতো একই জীব?' জেরায় প্রশ্ন করেন মিঃ ড্যারো।

'না, স্যার। তিনি এ-ও বলেছেন, মানুষের আছে নিজস্ব চিন্তাধারা ও বুদ্ধি।'

'এ সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে?' বিপক্ষ উকিলের দিকে তাকিয়ে ড্যারোকে নিম্নস্বরে টিপ্পনী কাটতে শোনা গেল।

এদিকে মামলা চলাকালে চারদিক থেকে এতো উৎসাহী লোক এসে কোর্টে ভিড় করতে শুরু করলো যে শেষ পর্যন্ত ভয় হলো ঐ পুরাতন কোর্ট হাউজটি মানুষের চাপে ভেঙে পড়ে কিনা। তাছাড়া গরমে ও প্রচণ্ড লোকের ভিড়ে কোর্টের কাজ চালানোই অসম্ভব হয়ে পড়লো। অথচ সবাই দেখতে চায় এই বিচারানুষ্ঠান।

শেষ পর্যন্ত ঘরের বাইরে সামনের উন্মুক্ত মাঠে একটি বড় মেপল্ গাছের নিচে কোর্ট নিয়ে আসা হলো। ঐ গাছের নিচে চেয়ারে বসে গেলেন জজ, জুরী, উকিলেরা সকলে। আর তাঁদের সামনে কাঠের বেঞ্চে ও ঘাসের ওপর বসার জায়গা পেলো দু'হাজারেরও বেশি কৌতূহলী দর্শক।

ভিড়ের ঠেলাঠেলি এবার কমলো। উন্মুক্ত স্থানে এভাবে বিচার পরিচালনা অভিনব হলেও এছাড়া তখন আর কোনো উপায় ছিল না। সর্বোপরি এব্যবস্থা সবারই মনঃপুত হলো।

বাদীপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণের পর মিঃ ব্রাইন উঠে দাঁড়ালেন সাক্ষীদের কথা সংক্ষেপে জুরীদের বুঝিয়ে দেবার জন্য।

'খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করে যে মানবজাতিকে ভগবান পাঠিয়েছেন

স্বর্গ থেকে। অথচ এই সব বিবর্তনবাদীরা প্রচার করছে যে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে নিম্নশ্রেণীর ঘৃণ্য জীব থেকে।'

এই যুক্তি শুনে দর্শকমণ্ডল আসামী পক্ষকে ধিক্কার দিয়ে মৃদু গুঞ্জন করে উঠলো।

উৎসাহ পেয়ে মিঃ ব্রাইন হাতে বায়োলজির একটি পাঠ্য বই দুলিয়ে বলে উঠলেন, 'যে-সব তথাকথিত বিজ্ঞানী এই বইয়ের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে এসেছে তাদের আমরা অস্বীকার করি।' একটু থেমে তিনি বাদীপক্ষের দিকে আঙুল তুলে গর্জন করে বলে উঠলেন, 'এইসব নাস্তিক বিশেষজ্ঞ শত শত মাইল দূর থেকে এখানে এসেছেন প্রমাণ করতে যে জীবের বিবর্তন দ্বারাই মানুষের সৃষ্টি। অসভ্য জঙ্গলবাসী তাঁদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষের যোগসূত্র খুঁজে বের করতে চান এঁরা। আর পবিত্র বাইবেলের বাণী ছেড়ে আমরা বুঝি তাই মেনে নেবো? না, মানুষ ঈশ্বরেরই মহান সৃষ্টি। তাঁরই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐশ্বরিক আদেশেই পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। আর সেটাই চিরন্তন সত্য।'

এই বলে নাটকীয় ভঙ্গিতে বসে পড়লেন মিঃ ব্রাইন। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত দর্শকবৃন্দের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। সমস্বরে 'আমেন' শব্দ উচ্চারিত হলো অনেকেরই মুখ থেকে।

কিন্তু তবুও যেন কোথায় ফাঁক রয়ে গেলো। ব্রাইন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মিতা ও তীক্ষ্ণ মেধার সঠিক পরিচয় দিতে পারেননি আজ, একথা অনেকেরই মনে হলো।

মিঃ ডাডলী মেলন এবার উঠে দাঁড়ালেন আসামীপক্ষ থেকে উত্তর দেবার জন্য। 'একমাত্র মিঃ ব্রাইনকেই বাইবেলের পক্ষে কথা

Mamun Academy

বলার কোনো সত্ত্বাধিকার দেয়া হয়নি। মিঃ ব্রাইন তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় রাজনীতি করে কাটিয়েছেন। অথচ দেশে এমন বহু লোক আছেন যাঁরা ঈশ্বর ও ধর্মের জন্য তাঁদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন। চিন্তার স্বাধীনতা অবশ্যই মানুষকে দিতে হবে। এটা মানব জাতির অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। অথচ মিঃ ব্রাইন অহেতুক ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে এক মারাত্মক সংঘর্ষ বাধিয়ে তুলেছেন, যার দ্বারা কোনো পক্ষেরই কোনো উপকার হবে না। লাভবানও হবে না কেউ।'

কথাগুলি যেন পাশে উপবিষ্ট মিঃ ব্রাইনের কানে শেলের মতো বিঁধলো। তিনি শুষ্ক মুখে গ্লাস থেকে একটু পানি পান করে নিলেন। আবার জলদ গম্ভীর স্বরে শুরু করলেন মিঃ মেলন, 'সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। সত্যের পথে থেকে আমরা কোনোরকম নিপীড়নের জন্যই ভীত নই। সত্য চিরস্থায়ী, চিরজীবী। তা প্রকাশের জন্য মিঃ ব্রাইনের অনুমতির প্রয়োজন হবে না। এমন কি কোনো মানুষের সমর্থনেরও দরকার নেই তাতে।'

মিঃ মেলনের এই উক্তিতে সমগ্র কোর্টরুম প্রচণ্ড উৎসাহে গুঞ্জন করে উঠলো। কিন্তু হলে কি হবে? বাগ্মিতায় মিঃ ম্যালন ব্রাইনের উপর জয়ী হলেন বটে, কিন্তু জজ রাউলস্টন ঘোষণা করলেন যে, এই মামলায় বৈজ্ঞানিকদের তিনি বিবাদী পক্ষের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হতে দেবেন না।

দুপুরবেলা যখন কোর্টের কাজে বিরতি হতো, তখন দেখা যেতো ছোট্ট ডেটন শহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে শত শত অচেনা মুখ। সবার মুখেই ঐ মামলার কথা। এ-নিয়ে পথে-ঘাটে দু'পক্ষের মধ্যে অনেক সময় তর্কাতর্কিও বেধে যেতো।

এক মজার কাণ্ড করে বসলো সনাতনী পক্ষের এক দোকানদার।

Mamun Academy

কোথা থেকে সে এক বানর যোগাড় করে এনে তা তার দোকানের শো-কেসের ভেতরে বসিয়ে রেখে বাইরে এক নোটিশ টাঙিয়ে দিল 'ডার-উইনের কথা কি ঠিক ? ভিতরে আসুন। দেখুন !' সেই সঙ্গে সে আবার দর্শকদের জন্য ১০ সেন্ট করে টিকিটেরও ব্যবস্থা করেছে। দর্শকেরা দর্শনী দিয়ে ভেতরে ঢুকলে দোকানদার রহস্য করে তাদের বলতো, 'দেখুন তো আপনার চেহারার সাথে ওর (বানরের) মিল আছে কিনা ? ওরাই তো এককালে আপনার পূর্বপুরুষ ছিল !'

শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠতো। আর বেচারা বানর হঠাৎ এতো লোকজন দেখে এক কোণে বসে লজ্জায় দু'হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রাখতো। তখন দোকানিদার বিদ্রূপের স্বরে বলতো, 'দেখুন তো বানরটি মানুষের মতোই কিভাবে লজ্জায় মুখ ঢেকে আছে। ওরা তাহলে আমাদের পূর্বপুরুষ হবার যোগ্যতা যথার্থই রাখে !'

বানরটিকে নাকি বাইরে রাস্তায় প্রদর্শন করারও ব্যবস্থা করা হয়। আর সাংবাদিকরা এইসব মজার কাহিনীও টেলিগ্রাফ করে পাঠাতো দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে।

এরপর এলো এই বিচারের সবচেয়ে উত্তেজনাময় মুহূর্ত। বি-বর্তন বাদ বিরোধী আইনের ধারার কথাগুলি এমনভাবে ছিল যার ওপর নির্ভর করে বাদীপক্ষ জোর দিচ্ছিলো যে, বাইবেলের বাণীর অর্থ করতে গিয়ে তার ঠিক আভিধানিক ব্যাখ্যাই গ্রহণ করতে হবে, তার কোনো রূপক অর্থ করা চলবে না।

এরপরই আসামী পক্ষ থেকে মিঃ ড্যারো উঠে তার বাজিমা-তের চাল চাললেন। তিনি নাটকীয়ভাবে বাদীপক্ষের প্রধান কৌ-সুলী মিঃ ব্রাইনকেই আহ্বান করলেন তাঁর সাক্ষী হিসাবে বাইবেলের

Mamun Academy

ব্যাখ্যা করার জন্য।

বাদীপক্ষের উকিল দেবে বিবাদীপক্ষের সাক্ষী! এমন কথা কেউ কখনো শুনেছে? এই অভিনব প্রস্তাবে এমন কি জজও আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি ড্যারোকে বললেন, 'আপনি কি সত্যিই তাঁকে ডাকছেন সাক্ষীর দলে বাইবেলের একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে?'

ড্যারো সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'বাইবেলের একজন অথরিটি হিসেবে মিঃ ব্রাইনের নাম জগদ্বিখ্যাত। তাই বাইবেলের কোনো অংশের প্রকৃত অর্থ তাঁর চেয়ে ভালো আর কে বলতে পারবেন?' যদিও মিঃ ব্রাইন চতুর ড্যারোর এই হঠাৎ আহ্বানের কারণ সম্বন্ধে সন্দেহযুক্ত ছিলেন, তবুও তিনি আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেন না, কারণ এটা ঠিক যে ধার্মিক ব্রাইন বৎসরের পর বৎসর ধরে বাইবেলের ব্যাখ্যা লিখেছেন ও এ-বিষয়ে বহু-বক্তৃতা করেছেন।

ধীর পদক্ষেপে ব্রাইন গিয়ে উঠলো সাক্ষীর কাঠগড়ায়। হাতে আছে তাঁর সেই তালের পাখাটি। মনে হলো যেন ঐ অস্ত্র দিয়েই তিনি বিরুদ্ধ পক্ষের সমস্ত আঘাত প্রতিহত করবেন। ড্যারো তাঁকে প্রশ্ন করলেন ধীর গলায়,'আপনি তো পবিত্র বাইবেলকে তার আভিধানিক অর্থ অনুযায়ীই বিশ্বাস করেন?'

'অবশ্যই তাই,' দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলেন ব্রাইন।

দর্শকরা উত্তর শুনে উল্লাসে 'আমেন' বলে ওঠে।

ড্যারো এক কপি বাইবেল হাতে নিয়ে তা থেকে পড়তে শুরু করেন 'এবং রাত্রি ও প্রাতঃকাল হলো (ঈশ্বরের সৃষ্ট) প্রথম দিন।' এইটুকু পড়ে ড্যারো জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি বাইবেলের কথা অনুযায়ী বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর সূর্য সৃষ্টি করলেন চতুর্থ দিনে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি,' ব্রাইন বললেন।

Mamun Academy

মৃদু হাসি খেলে গেল ড্যারোর চোখের কোণে। এবার তিনি দৃঢ় কণ্ঠে আচমকা প্রশ্ন করে বসলেন ব্রাইনকে, 'তাহলে ঈশ্বর দিন-রাত্রি সৃষ্টি করলেন সৃষ্টির প্রথম দিবসে, আর বাইবেল অনুসারে সূর্য সৃষ্টি করলেন চতুর্থ দিবসে। এখন প্রশ্ন, সূর্য সৃষ্টির আগেই কিভাবে পৃথিবীতে দিন-রাত্রির সৃষ্টি হলো? উত্তর দিন!'

এই প্রশ্ন শুনে ব্রাইনের মুখ কালো, গম্ভীর হয়ে উঠলো। তার বিশাল টাক মাথায় এবার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠলো। মুখে কোন উত্তর নেই।

দর্শকদের মধ্য থেকে এবার নিম্ন স্বরে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শোনা গেল। এমন কি সনাতনীরাও তাতে যোগ দিল। আবার প্রশ্ন করলেন ড্যারো, 'আপনি নিশ্চয়ই বাইবেলে 'ইভ'-এর কাহিনী সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন?'

'অবশ্যই করি।'

'আপনি বাইবেলের এই বাণীও নিশ্চয় বিশ্বাস করেন,' বলে ড্যারো বাইবেল খুলে তা থেকে পড়ে শুনাতে লাগলেন, 'এবং ঈশ্বর সাপকে তার অবাধ্যতার জন্য এই বলে শাস্তি দিলেন যে অতঃপর চিরদিনের মত সাপ বুকে হেঁটে চলবে।'

ব্রাইন বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি।'

'বেশ, তাহলে আপনি কি ধারণা করতে পারেন, এর আগে সাপ কিভাবে চলতো?'

ব্রাইন নিরুত্তর।

দর্শকেরা হেসে উঠলো। ব্রাইনের কান গরম হয়ে উঠলো। অসহায়ের মতো সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর হাতের পাখা দিয়ে জোরে জোরে বাতাস নিতে লাগলেন। তারপর রাগে ফেটে

Mamun Academy

পড়ে জজের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ইয়োর অনার! আমি মিঃ ড্যারোর সব প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে দেবো। আমি সমস্ত বিশ্বকে জানিয়ে দিতে চাই যে, এই নাস্তিক উকিল ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। আর সে ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর আঘাত হানার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে ভেটনের এই পবিত্র কোর্টকে।'

সঙ্গে সঙ্গে ড্যারোও জজের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আমি সাক্ষীর এই অসংলগ্ন উক্তিতে ভয়ানক আপত্তি করছি।'

ব্রাইনের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আমি আপনাকে এসব প্রশ্ন করছি শুধু আপনার কতকগুলি অবাস্তব ও গোঁড়া অভিমতকে বাস্তবসম্মত করার জন্য। কারণ আপনার বর্তমান অভিমত কোনো বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন খ্রীষ্টানই বিশ্বাস করবেন না।'

জজ রাউলসটন এই নাজুক পর্যায়ে তাঁর হাতুড়ি পিটিয়ে ঘোষণা করলেন যে পরদিন পর্যন্ত শুনানী মুলতুবী রইলো। ব্রাইনকে এবার বড় একলা, বড় নিঃসঙ্গ মনে হলো। উৎসুক লোকেরা এবার তাঁকে পাশ কাটিয়ে ড্যারোর সঙ্গে করমর্দন করতে ভিড় জমালো।

পরদিন দুপুরে জুরীদের কাছে মামলা সম্বন্ধে তাঁদের রায় চাওয়া হলো।

জুরীরা নির্জনে মাঠের এককোণে একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে অল্প কিছুক্ষণ আলোচনা করে মাত্র নয় মিনিটের-মধ্যেই ফিরে এসে তাঁদের রায় ঘোষণা করলেন। তাঁরা সবাই একমত যে, আসামী জন স্কোপস্ দোষী। জজও তাঁদের সঙ্গে একমত হয়ে আসামীকে খরচা সহ একশত ডলার জরিমানার আদেশ দিলেন।

ডাডলী মেলন এই সাজাকে 'বিজয়ের শাস্তি' বলে অভিহিত

করলেন। অবশ্য কতকগুলি গোঁড়া ধর্মান্ধ কাগজ এই মামলাকে ব্রাইনের বিজয় বলে উল্লেখ করলো।

ব্রাইন কিন্তু এই কেসের ধাক্কা সামলে উঠতে পারলেন না। পরিশ্রান্ত ও দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই মামলার রায়ের মাত্র দু'একদিন পরে ভেটনেই তিনি হঠাৎ করে মারা গেলেন।

কোর্টে এই সাজার পর জন স্কোপস তাঁর চাকরি ছেড়ে দিলেন। তাঁকে পরে ঐ চাকরিতে ফিরে আসতে অনুরোধ করা হলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। মামলায় যে সব প্রফেসর তাঁর পক্ষে সাক্ষী দিতে এসেছিলেন তাঁদেরই কারো কারো চেষ্টায় জন স্কোপস্ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি স্কলারশিপ পেয়ে গেলেন।

শিক্ষা শেষে তিনি দক্ষিণ আমেরিকা ও লুইজিয়ানায় একটি তেল কোম্পানীর জিওলজিস্ট পদে চাকরি নিয়ে চলে যান।

এর দীর্ঘ ৩৫ বৎসর পরে জন স্কোপস্ আবার একদিন বেড়াতে এলেন তাঁর যৌবনের অমর স্মৃতি-বিজড়িত সেই ভেটন শহরে।

ছোট্ট শহরটি এতদিন পরও প্রায় একই রকম আছে। তবে এখন এর সুন্দর উপত্যকা জুড়ে শোভা পাচ্ছে একটি আধুনিক সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয় ভবন। সামনে বড় বড় অক্ষরে নাম খোদাই করা রয়েছে, 'উইলিয়াম জেনিংস ব্রাইন বিশ্ববিদ্যালয়'। বলা বাহুল্য, এই শহরের সেই বিখ্যাত মামলার দু'দিন পর মৃত সরকারী কৌঁসুলী ব্রাইনের স্মৃতিতেই এই নামকরণ।

আরও কতকগুলি পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন এবার জন স্কোপস্। বিবর্তনবাদ ও ডারউইনের থিওরী এখন অবাধে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে ভেটনসহ, টেনেসী রাজ্যের সব স্কুল-কলেজে, যদিও ৩৫ বৎসর

আগেকার সেই আইন এখনও এ রাজ্যে বলবৎ আছে। তবে এখন শহরের সবার ভাবতেও অবাক লাগে যে, সেই যুগে ঐ তত্ত্ব শিক্ষা দেবার কারণেই একদিন কোর্টে তাঁকে সাজা পেতে হয়েছিল।

সেই ৩৫ বৎসর আগে ভেটনের ক্ষুদ্র কোর্টে তাঁর পক্ষের কৌসুলী ড্যারো ও ডাডলী মেলন তাঁদের অপূর্ব মেধা, বাগ্মিতা ও সাহস দেখিয়ে সেদিন শিক্ষা ও প্রগতির সমর্থনে যে ঝড় তুলেছিলেন, কালক্রমে তারই স্বাধীন, মুক্ত প্রবাহ ভেটনের সমস্ত স্কুল, কলেজ ও আইন সভাকে কলুষ ও অন্ধ সংস্কার থেকে মুক্ত করে নতুন জ্ঞান শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। কালক্রমে সেই কুসংস্কার মুক্ত পরিবেশ শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতার অধিকারকে সমগ্র আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত করে দেশকে উন্নতির শিখরে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

এখানে দাঁড়িয়ে ৩৫ বৎসর পর বৃদ্ধ জন স্কোপস্ আজই প্রথম তাঁর মামলার সার্থকতা পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করলেন। আমেরিকার প্রগতির ইতিহাসে ঐ মামলার দান অপরিসীম বলা চলে।

Mamun Academy

অনিল পাণ্ডের হত্যা

খুলনার জেলা সেশন জজ আদালত।

১৯৭৮ সালের ২৫শে জুলাই। কোর্টে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। বাইরেও বহু লোকের ভিড়। চোখে মুখে উত্তেজনা নিয়ে সবাই প্রতীক্ষারত। এখানে আজ অনিল পাণ্ডে হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করা হবে।

এই বিখ্যাত খুনের মামলার আসামী দু'জন। একজন অনিল পাণ্ডের যুবতী স্ত্রী শেফালী পাণ্ডে অন্যজন ২০/২২ বৎসরের তরুণ পুনর্ধন জয়ধর। পুলিশ আসামী দু'জনকে কোর্টের কাঠগড়ায় উঠিয়ে তাদের হাতকড়া খুলে দিল। রায় শোনার জন্য তারা জজ বাহাদুরের দিকে হাত জোড় করে দাঁড়ালো। কোর্টে তখন পিনপতন নিস্তব্ধতা।

কেস রেকর্ডটি হাতে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বিচারক ঘোষণা করলেন তার রায়—'এই মামলায় বিজ্ঞ এসেসরদের মতের সঙ্গে আমিও একমত হয়ে অনিল পাণ্ডেকে খুন করার অপরাধে আসামী পুনর্ধন জয়ধর ও শেফালী পাণ্ডেকে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে তাদের উভয়কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করছি। তাদের গলায় ফাঁসি দিয়ে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হবে।'

(এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে

Mamun Academy

তৎকালীন ভারতে কোনো আসামীর মৃত্যুদণ্ডের হুকুমের রায়ে জজ-বাহাদুর শুধু লিখতেন—'আসামীকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলানো হবে'। আর তখন ঐ রায়ের বলেই আসামীকে ফাঁসী দিয়ে প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হতো। শোনা যায় বহু বৎসর আগে একবার এক ধুরন্ধর উকিল প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত তার মক্কেল আসামীকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টায় এক অভিনব ফন্দি আঁটলো। সে কোর্টের রায়ের এক কপি নকল বগল-দাবা করে আসামীর ফাঁসির দিন সময় মতো জেলখানায় এসে হাজির হলো, ফাঁসি দেয়ার আগেই সে ফাঁসিকাষ্ঠের খুব কাছে এসে অপেক্ষা করতে লাগলো। যথাসময়ে আসামীর মুখ কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে, ফাঁসির দড়ি গলায় পরিয়ে যেই তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়া হলো, সঙ্গে সঙ্গে উকিল বাবু জজের রায়ের নকল হাতে নিয়ে উচ্চ-স্বরে চিৎকার করে অবিলম্বে আসামীকে নামিয়ে আনতে বললো ও নিজেও এগিয়ে গিয়ে তাকে উচু করে ধরে অর্ধমৃত অবস্থায় ফাঁসি-কাষ্ঠ থেকে নামাতে সাহায্য করলো। উকিলের এই অভিনব কাণ্ড দেখে সেখানে এক জটলার সৃষ্টি হলো। উপস্থিত ম্যাজিস্ট্রেট ও সি-ভিল সার্জন দৌড়ে এলেন। দেখলেন, তখনো আসামীর মৃত্যু হয়নি। তাঁরা আবার তাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চাইলেন। কিন্তু উকিল বাধা দিল। সে কোর্টের রায়ের নকল বের করে ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখালো। সেখানে শুধু লেখা আছে,'The accused will be hanged.' উকি-লের অকাট্য যুক্তি : আসামীকে তো মাননীয় কোর্টের আদেশ মো-তাবেক ফাঁসিকাষ্ঠে ঠিকই ঝোলানো হয়েছে। আদেশের কোথাও তো তাকে ঝুলিয়ে রেখে মেরে ফেলতে বলা হয়নি। এভাবেই চতুর উকিল সে-যাত্রা শেষ মুহূর্তে তার আসামী মক্কেলের প্রাণ রক্ষা করে। এই নাটকীয় ঘটনার পর থেকেই নাকি বিচারকেরা মৃত্যুদণ্ডের আদেশ

Mamun Academy

প্রদানের সময় পরিষ্কার ভাষায় রায়ে লেখেন, 'The accused will be hanged by the neck till his death,' অর্থাৎ মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আসামীকে গলায় ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হবে।)

আমাদের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

মৃত্যুদণ্ডের রায় স্বাক্ষর করার পরই জজ সাহেব সেই কলমটি ভেঙে ফেলে দিলেন (কোর্টের ট্র্যাডিশন অনুযায়ী যে-কলমে একজন মানুষের প্রাণদণ্ডের আদেশ সই করা হয়, সেই কলম দিয়ে আর কোনো কাজ করার রেওয়াজ নেই)। সেদিন তিনি কোর্টে আর কোনো কাজ করবেন না বলে জানিয়ে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে নিজ চেম্বারে চলে গেলেন।

আসামী দু'জন রায় শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লো। তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা হায় হায় করতে লাগলো। উপস্থিত পুলিশ আসামীদের হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গেল জেলের কনডেমড্ সেলে। সেখানেই তাদের থাকতে হবে ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত। কোর্টে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল—'বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত সাজাই হয়েছে,' আস্তে আস্তে কোর্টরুম ফাঁকা হয়ে গেল।

হত্যাকাণ্ডটি ঘটে ১৯৭৭ সালের ১৫ই মার্চ দিবাগত রাত ৩টা বা ৩টা ৩০ মিনিটে খুলনা শহরের খ্রীষ্টান পাড়ায়। ঐ রাতে নিহত অনিল পাণ্ডে তার স্ত্রী আসামী শেফালী পাণ্ডে ও তাদের দুবছরের নাবালক পুত্র অশোক সহ তাদের ঘরের চৌকির উপর ঘুমিয়েছিল। এটি ছিল তাদের বসতবাটীর দক্ষিণ দিকের পূর্ব দুয়ারী ঘর। এর পার্শ্ববর্তী উত্তরের কামরায় সে-রাতে ছিলেন অনিল পাণ্ডের পিতা মনোরঞ্জন পাণ্ডে তাঁর ষোল বৎসরের আর এক পুত্র স্টিফেনকে নিয়ে এক পাশে, অন্য পাশে সেদিন ঘুমিয়েছিল সদ্য আগত ওদের এক আত্মীয়।

Mamun Academy

অনিলের মামা অশ্বিনী বিশ্বাস ও মামী সুভাষিনী বিশ্বাস ঐ দিনই তারা গ্রামের বাড়ি থেকে খুলনা শহরে আসে। মঙ্গলা পোর্টের জন্য তাদের কিছু জমি সরকার হুকুম দখল করে নেয়। তারা ঐ জমির ক্ষতিপূরণের টাকা উঠিয়ে নিতে খুলনায় এসে এই আত্মীয় বাড়িতে ওঠে। দু'কামরার মাঝখানে একটি মুলি বাঁশের বেড়া, তাতে একটি দরজা আছে দু'ঘরের মধ্যে যাতায়াতের জন্য। উভয় কামরার সামনে দিয়ে একটি টানা বারান্দা আছে। বারান্দায় যাওয়ার জন্য দুটি দরজাও আছে।

রাত তখন তিনটা-সাড়ে তিনটা হবে। এ সময় শেফালী পাণ্ডে পাশের ঘর থেকে উঠে এসে অশ্বিনী ও সুভাষিণীকে ঘুম থেকে ডেকে তুললো। ওরা জেগে উঠতেই শেফালী হাঁপাতে হাঁপাতে বললো—'মামা মামী উঠে দেখো তোমাদের ছেলে যেন কেমন করছে।'

এ কথা শুনে ওরা দুজনেই ধড়মড় করে উঠে বসলো। পিতা মনোরঞ্জন ও স্টিফেনও জেগে গেল। ওরা সবাই দৌড়ে গেল অনিলের ঘরে। সেখানে অনিলের মশারীর ভেতর তখনো একটি হারিকেন জ্বলছিল। ঘরের এক কোণে একটি জ্বলন্ত কুপিও ছিল। পিতা মনোরঞ্জন ছেলের বিছানার মশারী তুলেই আঁৎকে উঠলেন,—দেখা গেল, ছেলে অনিল গলা কাটা অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে। রক্তে বিছানা ও মশারী ভেসে গেছে। তার গলায় সদ্য কাটা বিরাট ক্ষত। এই বীভৎস দৃশ্য দেখে সবাই চিৎকার করে উঠলো। ওদের হৈ চৈ শুনে পার্শ্ববর্তী বাসিন্দাদের মধ্যে গ্যাব্রিয়েল হাওলাদার, ধীরেন বিশ্বাস, নটবর, পঙ্কজিনী বিশ্বাস ইত্যাদি অনেকেই ছুটে এলো সেখানে।

Mamun Academy

কিভাবে এটা ঘটলো তা নিহতের স্ত্রী শেফালীকে উপস্থিত সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলো। শেফালীকে তখন খুব বিচলিত দেখা গেল—তাকে কতকগুলো অসংলগ্ন উক্তিও করতে শোনা গেল। এক প্রশ্নের উত্তরে সে বলে, রাতে ঘরের দরজা খুলে সে পায়খানায় গিয়েছিল সেই ফাঁকে কেউ ঘরে ঢুকে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। আবার কিছুক্ষণ পরে বলে,রাতে সে জলপান করতে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, তখন ঘরে ঢুকে কে বা কারা এই ঘটনা ঘটায়।

এতবড় একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল, থানায় এজাহার দেয়া দরকার এখনই। পিতা মনোরঞ্জন থানায় যাবেন এজাহার দিতে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর কে যাবে। অনেকেই প্রস্তাব করলো পড়শী পুনর্ধন জয়ধরকে সঙ্গে যেতে। কিন্তু শার্টে রক্তের দাগ লেগে আছে, তাই থানায় যেতে আপত্তি করলো সে। অতঃপর ছোট ছেলে অ্যাণ্ড্রুকে নিয়ে পিতা কোতোয়ালী থানায় গিয়ে ভোর সাড়ে পাঁচটায় এজাহার দিয়ে এলেন।

ভোর ৭টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌছুলো। তারা প্রথমে অনিল পাণ্ডের মৃতদেহের সুরতহাল লিখে নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে রক্তমাখা মশারী, তোয়ালে এবং বিছানার চাদর সংগ্রহ করে পুলিশ হেফাজতে রাখলো। তারা নিহতের ঘর থেকে হারিকেন,পিতলের কুপি ও রক্তমাখা একটি তালের পাখাও সীজ করলো।

সন্দেহক্রমে দারোগা সাহেব পুনর্ধন জয়ধরকে ডেকে এনে জেরা শুরু করলেন। অনেকেরই সন্দেহ হয়েছিল তার উপর। প্রথমে পুনর্ধন ঘটনা সম্পর্কে তার কোনো হাত থাকার কথা অস্বীকার করে। কিন্তু কিছুক্ষণ জেরা করতেই ভেঙে পড়ে সে, আসল সত্য বেরিয়ে আসে। সে সাক্ষীদের সামনেই স্বীকার করে যে, শেফালী পাণ্ডের

Mamun Academy

প্ররোচনায়ই সে কাঠমিস্ত্রীর বড় ড্যাগার দিয়ে অনিলকে হত্যা করেছে। তারপর সে তার ঘরের চৌকির নিচে রাখা কাঠকুটোর তলা থেকে কাঠের হ্যাণ্ডেলযুক্ত একটি বড় ড্যাগার বের করে আনে। সেটার হ্যাণ্ডেলে খোদাই করা ছিল '১০৮ গিরোডিয়াস। এটি ছিল খ্রীষ্টান মিশন থেকে তার ভাইকে দেয়া কাঠমিস্ত্রীর কাজে ব্যবহারের একটি যন্ত্র।

অতঃপর পুলিশ পুনর্ধন ও শেফালীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গেল। তারা উভয়েই অনুতপ্ত হয়ে হাকিমের কাছে নিজেদের দোষ স্বীকার করতে আগ্রহ প্রকাশ করলো। পুলিশ ঐ দিনই খুলনার তৎকালীন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আমানুল্লাহর সামনে তাদের হাজির করলো।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার পূর্বে সব পুলিশকে ওখান থেকে সরিয়ে দিলেন। তারপর আইনের বিধান অনুযায়ী ওদের সতর্ক করে বললেন যে আসামী হিসেবে তারা কেউ স্বীকারোক্তি করতে আইনত বাধ্য নয়; তবুও যদি তারা স্বেচ্ছায় কোনো স্বীকারোক্তি করে তবে সেটা তাদের বিরুদ্ধেই বিচারেরসময় ব্যবহৃত হতে পারে। অতঃপর চিন্তা-ভাবনা করবার জন্য তিনি তাদের নিজ চেম্বারে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলেন। পুলিশ তাদের ওপর কোনো অত্যাচার করেনি বা পুলিশের মারের ভয়ে তারা এখানে স্বীকারোক্তি করতে আসেনি বরং তারা স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করতে এসেছে এসব কথা ভালভাবে জেনে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট তাদের স্বীকারোক্তি রেকর্ড করে নিলেন।

এর আগেই পুলিশ নিহতের লাশ পোস্টমর্টেম করার জন্য খুলনা সদর হাসপাতালে পাঠালো। সেখানে ডাঃ নুরুল ইসলাম জোয়ার্দার

লাশের ময়না তদন্ত করে দেখতে পান যে নিহতের গলার সামনের বাঁ দিকে নয় ইঞ্চি লম্বা ও চার ইঞ্চি গভীর একটি কাটা ক্ষত আছে, যার কারণে ওর মৃত্যু হয়েছে। ডাক্তারের মতে ড্যাগার জাতীয় কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওটা করা হয়েছে।

এবার ঘটনার আগের কাহিনীতে আসা যাক।

আসামী পুনর্ধন ওরফে কুন্থ নিহত অনিলের পাশের বাড়ির বাসিন্দা। পুনর্ধনের বড় ভাই-এর নাম অ্যাণ্ড্রু, সে তার বড় ভাই অ্যাণ্ড্রুর সঙ্গে ঐ একই বাসায় থাকতো। অ্যাণ্ড্রু পেশায় ছিল একজন কাঠমিস্ত্রী। পুনর্ধন তারই সহকারী হিসেবে তাকে ঐ কাজে সাহায্য করতো। স্থানীয় ক্রিশ্চিয়ান মিশন হতে অ্যাণ্ড্রুকে এক বাক্স বিদেশী কাঠমিস্ত্রীর সরঞ্জাম দান করা হয়। তার মধ্যে হত্যাকার্যে ব্যবহৃত কাঠের বাঁটওয়ালা '১০৮ গিরোডিয়াস' মার্কযুক্ত বড় ড্যাগার জাতীয় অস্ত্রটিও ছিল,অনিল ও অ্যাণ্ড্রুর বাড়ির মধ্যে মাত্র ৪/৫ হাতের ব্যবধান। লাগা পড়শী হিসেবে দুই ক্রিশ্চিয়ান পরিবারের মধ্যে যাতায়াত ও সখ্যতা ছিল প্রচুর। এরই ফাঁকে অনিলের স্ত্রী শেফালী ও ২০/২২ বৎসরের যুবক পুনর্ধনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রণয় জমে ওঠে। তারই পরিণতি হিসাবে ওদের মধ্যে গভীর প্রেম ও অবৈধ সংসর্গ গড়ে ওঠে। তাদের হাবভাব ও সন্দেহজনক আচরণ উভয় বাড়ির বাসিন্দাদের কাছেই দৃষ্টিকটু মনে হয়। ঘটনার মাস ছয়েক আগে থেকেই তাদের মধ্যে এই প্রেমের সূত্রপাত। ঘটনার দুই দিন আগে অ্যানড্রুর স্ত্রী পঙ্কজিনী বিশ্বাসের কাছে শেফালী অভিযোগ করে বলে, তার স্বামীর কাছে অ্যানড্রু নালিশ করেছে এই বলে যে তার (শেফালীর) ও পুনর্ধনের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা অবৈধ প্রেমের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। নিজের স্ত্রীকে যেন অনিল এ ব্যাপারে শাসন করে।

Mamun Academy

এ কথা শুনে অনিল সেদিন শেফালীকে খুব গালাগালি ও মারধোর করেছে। শেফালী পঙ্কজিনীকে তখন একথাও বলে যে,অন্যায় অত্যাচারের শিক্ষাও সে তার স্বামীকে দেবে।

ঘটনার দিন ১৫ই মার্চ বিকেল চারটার সময় পঙ্কজিনী (৫ নং সাক্ষী) দেখতে পায় তার দেবর পুনর্ধন ওদের পুকুরের শানবাঁধানো ঘাটের উপর ঘষে ঘষে মিস্ত্রীর বড়ছোরাটি ধার করছে। তারপর ধার পরীক্ষার জন্য পুনর্ধন নিকটবর্তী নারকেল গাছের একটি ডাল এক কোপে কেটে ফেলে (পুলিশ ঐ কাটা ডালটি সীজ্ করে নেয়)। তা দেখে পঙ্কজিনী দেবরকে জিজ্ঞাসা করে—'অস্ত্রটি অত ধার করছো কেন ?'

উত্তরে দেবর বলে যে ওটা দিয়ে সে মুরগী কাটবে। ঐ দিনই আবার বিকেল পাঁচটার সময় পঙ্কজিনী দেখতে পায় পুনর্ধন তাদের ঘরের বারান্দায় বসে ঐ ড্যাগারটি কাঠের 'বলিকাচার উপর ঘষে ধার করছে। (বিচারের সময় কোর্টে ঐ বলিকাচাও হাজির করা হয়)

নিহত অনিলের মামীও সেই রাতে তাদের বাড়ির অতিথি সুভাষিণী বিশ্বাস কোর্টে সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে, ঘটনার রাতে খাওয়াদাওয়ার পর তারা পাশের ঘরে ঘুমাতে যায়। গভীর রাতে সে প্রস্রাব করার জন্য উঠে ঘরের বাইরে আসতেই দেখতে পায়, অত রাতেও শেফালী ও পুনর্ধন ওদের দুই বাড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি যেন আলোচনা করছে। সুভাষিণীকে দেখেই তারা শঙ্কিত হয়ে যে যার ঘরে চলে যায়।

নিহতের বাবা মনোরঞ্জন পাণ্ডেও কোর্টে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে আসামী পুনর্ধন ও তার পুত্রবধূ শেফালীর মধ্যে অবৈধ সংসর্গ গড়ে

Mamun Academy

উঠেছিল, যা তাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। স্ত্রীর এই পদস্খলনের জন্য অনিল শেফালীকে শাসন করেও তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

ঘটনার পরদিন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিতে শেফালী বলে, —কয়েক মাস আগে থেকেই নিকট প্রতিবেশী পুনর্ধনের সঙ্গে আমার প্রেম ও ভালোবাসা গড়ে ওঠে। ঘটনার দিন রাত তিনটার সময় আমি ঘুম থেকে জেগে উঠে রান্নার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকি। এমন সময় পুনর্ধন লুকিয়ে আমার কাছে এসে বলে, আমার আগের অনুরোধ অনুযায়ী সে আজ রাতেই অনিলকে খুন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। এ কথা শুনে আমি বলি—যদি তোমার সাহস থাকে তাহলেই এ কাজে হাত দিতে পারো। তবে আমি ঐ বীভৎস দৃশ্য সহ্য করতে পারবো না —তাই আমি দূরে সরে থাকবো। এই বলে আমি ঘরের বাইরে উঠানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। রাত অনুমান তিনটা-সাড়ে তিনটায় অনিলকে হত্যা করা হয়।

শেফালী তার স্বীকারোক্তিতে আরও বলে যে এর আগে কয়েক বারই সে তার প্রেমিক পুনর্ধনকে অনুরোধ করেছে তার স্বামীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য। কারণ তাহলেই সে পুনর্ধনকে বিয়ে করে সুখী হতে পারবে। যেহেতু তাদের একটি বাচ্চা আছে, তাই স্বামী বেঁচে থাকতে সে পুনর্ধনকে বিয়ে করতে পারবে না।

অন্যদিকে আসামী পুনর্ধন ঐ একই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার স্বীকারোক্তিতে বলে— 'শেফালীর সঙ্গে মাস ছয়েক আগে থেকেই' আমার গভীর প্রেম গড়ে ওঠে। শেফালী তাকে প্রায়ই বলতো সে আমি যদি ওর স্বামীকে খুন করতে পারি তবেই সে আমাকে বিয়ে করবে। এভাবে অনিলকে হত্যা করতে সে তিন-তিনবার আমাকে প্ররোচিত করেছে। ঘটনার ছমাস আগে শেফালী আমাকে বলে, আমি

Mamun Academy

যদি তার স্বামীকে খুন করে ওকে বিয়ে না করি তবে সে গলায় দড়ি দিয়ে এখনই আত্মহত্যা করবে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ওরকম কাজ থেকে বিরত থাকতে বলি ও তার অনুরোধ রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দেই। তবে সেই সঙ্গে তাকে এ কথাও জিজ্ঞেস করি যে তার স্বামীকে হত্যা না করলেও সে আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারবে কিনা? উত্তরে সে রেগে গিয়ে বলে—'তুমি কেমন পুরুষ মানুষ? আমাদের মিলনের পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য এই কাজটুকু করার সাহসও তোমার নেই?' অগত্যা আমি তার কথা মেনে নিয়ে আশ্বাস দিই যে সুযোগ মত আমি ওর স্বামীকে হত্যা করবো।

ঘটনার দিন রাত তিনটার সময় শেফালী তার ঘর থেকে বেরিয়ে আমার কাছে এসে বলে যে, সে তাদের ঘরের দরজা খুলে মশারী উঠিয়ে রেখেছে। এই সুযোগে আমি যেন সোজা ঐ ঘরে ঢুকে ওর স্বামীর গলা কেটে বেরিয়ে আসি। ওর কথামত আমি ঐ ঘরে ঢুকে ড্যাগার দিয়ে ঘুমন্ত অনিল পাণ্ডের গলা কেটে ফেলি, যার ফলে সে সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়।

সেশন কোর্টে এই মামলার বিচারের সময় অবশ্য উভয় আসামীই ঘটনার পরপর পড়শীদের কাছে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাদের স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি করার কথা অস্বীকার করে। আসামীরা তখন বলে যে পুলিশের অত্যাচারে ও ভয়ে তারা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মিথ্যা উক্তি করতে বাধ্য হয়েছে। ওটা তাদের স্বেচ্ছা প্রণোদিত উক্তি নয়।

অবশ্য মাননীয় জেলা জজও আপীলের শুনানীর সময় হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি আসামীদের পরবর্তীকালের ঐ অজুহাত অবিশ্বাস করেন।

সেশন জজ কোনো আসামীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলে আইন অনুযায়ী ঐ রায় হাইকোর্টে অবিলম্বে পাঠাতে হয় ও সেখানে বিচারপতি ঐ রায় অনুমোদন করলেই তবে ঐ দণ্ড কার্যকারী করা যায়।

এই মামলার আপীল শুনানী করেন তৎকালীন ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় জাস্টিস চৌধুরী এ. টি. এম. মাসুদ ও জাস্টিস মোঃ হাবিবুর রহমান। আসামী পক্ষ সমর্থন করেন অ্যাডভোকেট জনাব হাবিবুল ইসলাম ভূঁইয়া, জনাব ফজলুল করিম, ও জনাব এম. এ. আজিজ। অন্যদিকে সরকার পক্ষে উপস্থিত হন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন।

উভয় পক্ষের শুনানীর পর মাননীয় বিচারপতি তাঁর রায়ে বলেন যে যদিও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কেসে প্রত্যক্ষ বা চাক্ষুষ সাক্ষী নেই, তবুও ঘটনার আগে উভয় আসামীর মধ্যে অবৈধ প্রেম ও হত্যার পরপরই উভয় আসামীর স্বীকারোক্তি ও আসামী পুনর্ধন কর্তৃক হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ড্যাগারটি তার চৌকির তল থেকে বের করে দেয়া, ঘটনার পরপরই আসামী শেফালীর অস্বাভাবিক আচরণ ও অসংলগ্ন কথাবার্তা প্রভৃতি এটাই প্রমাণ করে যে, পুনর্ধন ও শেফালী তাদের অবৈধ প্রেমের পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য ও শেফালীর মতো একজন বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীর উস্কানিতে আসামী পুনর্ধন অনিল পাণ্ডেকে ঠাণ্ডা মাথায় ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করেছে। এই মামলার ঘটনা পরম্পরার সাক্ষীসমূহ (circumstantial evidence) এত প্রবল যে তা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। তাই আসামী পুনর্ধনের ফাঁসির হুকুম ন্যায্যই হয়েছে। এবং তাঁরা সেই আদেশ বহাল রাখেন।

আসামী শেফালী পাণ্ডে সম্পর্কে অবশ্য মাননীয় বিচারপতিদ্বয়

Mamun Academy

আপীলের রায়ে বলেন যে, এখানে দেখা যাচ্ছে—আগে উস্কানি দিলেও, অনিলকে খুন করার সময় কিন্তু শেফালী নিজে সেখানে উপস্থিত না থেকে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। এবং খুনের কাজে সে প্রত্যক্ষ অংশ নেয়নি, সে এই হত্যাকাণ্ডে শুধু সাহায্যকারী হিসেবেই কাজ করেছিল। তাছাড়া আসামী শেফালীর কোলে একটি শিশু ছিল, যাকে তার হাজত বাসের সময়ও কোর্ট সঙ্গে রাখার অনুমতি দিয়েছিল।

মাননীয় বিচারপতিরা আসামী শেফালীর চরম প্রাণদণ্ডের আদেশ কমিয়ে তাকে ফৌঃ দণ্ডবিধির ৩০২/১০৯ ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন।

Mamun Academy

পাপের প্রায়শ্চিত্ত

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডকে একদিকে যেমন উন্নতির বা রেঁনেসার যুগ বলা হয়, আবার অন্যদিকে সেই যুগেই ইংল্যাণ্ড অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা, গোপন হত্যা, বিকৃত যৌন কেলেঙ্কারী ইত্যাদি বহু ঘটনার লীলাভূমিও হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত রাজপরিবার, রাজ-প্রাসাদ ও তার আশেপাশের ওমরাচোমরাদের দিয়েই তখন চলতো ঐ সব প্রাসাদ ষড়যন্ত্র।

রাণী প্রথম এলিজাবেথের মৃত্যুর পর রাজা জেমস ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৬০৩ সালে। তাঁরই আমলে বিখ্যাত লণ্ডন টাওয়ারে স্যার টমাস ওভারবারীর (Sir Thomas overbury) গোপন হত্যাকাণ্ড ও তার জের আজও ইংল্যাণ্ডের অপরাধ-ইতিহাসে স্থায়ী আসন দখল করে আছে।

রাজা জেমস ছিলেন এক বিপরীত চরিত্রের ব্যক্তি। একদিকে তিনি ছিলেন ভদ্র, সহানুভূতিশীল, ও বিবেচক নরপতি। অন্যদিকে আবার তাঁর ছিল কতগুলি মারাত্মক দোষ—যার অন্যতম ছিল বিকৃত যৌনলিপ্সা, বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মোহান্ধতা ইত্যাদি। রাজা জেমসের জিহ্বা ছিল অস্বাভাবিক রকম বড়। ফলে কথা বলার সময় তাঁর মুখ নড়তো বেশি, আর মনে হতো বুঝি সর্বক্ষণ তিনি জিহ্বা দিয়ে কিছু চাটছেন। শরীরের অনুপাতে তাঁর পা দুটি

Mamun Academy

ছিল চিকন ও দুর্বল। তাই অন্যের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। আর রাজপরিবারে জন্মেও তাঁর ছিল এক মারাত্মক যৌন বিকৃতি—তিনি ছিলেন সমকামী। আর সে কারণেই সুশ্রী বালকদের প্রতি তাঁর মোহ ও লালসা ছিল মাত্রাতিরিক্ত।

চারিত্রিক এই দুর্বলতার কারণেই 'রবার্ট কার' নামক স্কটল্যাণ্ডের এক সুদর্শন যুবকের প্রতি তাঁর নজর পড়ে যায়। রবার্ট কার ছিল এক ভদ্র পরিবারের সন্তান,—তার পিতার নাম স্যার রবার্ট কার। ১৬০৬ সালে এক খেলায় অংশ গ্রহণের সময় বালক রবার্টের পা ভেঙে যায়। সেই সময়েই রাজার নজরে পড়ে এই দীর্ঘ ও সুদর্শন যুবক। বালক কারের প্রতি খুশি হয়ে তিনি প্রথমে তাকে রাজকার্যের পেজ বা বালক ভৃত্য হিসেবে নিয়োগকরেন। অল্পদিনের মধ্যেই রবার্ট কার রাজা জেমসের এত প্রিয় হয়ে ওঠে যে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সেই সময় লণ্ডন টাওয়ারে বন্দী বিখ্যাত স্যার ওয়াল্টার র‍্যালীর বাজেয়াপ্ত করা বিশাল সম্পত্তি তিনি কারকেই অর্পণ করেন। সেই সঙ্গে তিনি যুবক কারকে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবেও নিয়োগ করেন। ১৬১০ সালে যখন কারের বয়স মাত্র ২০ বৎসর তখন তারই প্ররোচনায় রাজা তৎকালীন পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়ে দেশে এক রাজনৈতিক আলোড়নের সৃষ্টি করেন।

এর অনেক আগে ১৬০১ সালে যখন রবার্ট কার মাত্র ১৩ বৎসরের এক ফুটফুটে বালক, তখন থেকেই আর একজন সমকামী (Homo Sexual) ব্যক্তির সঙ্গে রবার্টের অনুরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তার নাম টমাস ওভারবারী। কারের চেয়ে সে ছিল ১১ বৎসরের বড়। ওর গায়ের রং তামাটে, এবং সে অত্যন্ত চতুর ছিল। ওভারবারী কাজকর্মেও ছিল বেশ দক্ষ। আর গোপনীয়তা রক্ষা

করা ছিল তার চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

রাজা জেমসের সুনজরে পড়ার পর এবার রবার্ট কার ওভারবারী-কে নিজের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত করলো। বাল্যকালে এই কারই ওভারবারীর অধীনে নগণ্য চাকরের কাজ করতো যখন ও-ভারবারী ওকে কুকর্মের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করতো। গ্রহের ফেরে এখন আবার ঐ বালকের অধীনেই প্রাইভেট সেক্রে-টারীর পদ গ্রহণের ব্যাপারটা ওভারবারীর কাছে অস্বস্তিকর হলেও সে তা সানন্দেই গ্রহণ করলো। আর এই সুযোগে সে রাজ দরবারে ঠাঁই করে নেবার দুর্লভ অধিকারটিও পেয়ে গেল, এমন কি এখন থেকে সে রাজার নামের সমস্ত চিঠি ও গোপন কাগজ-পত্র পড়বার ও সেগুলোর উত্তর পাঠাবার দায়িত্ব পেল। চতুর ওভারবারী অবশ্য কারের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে অচিরেই অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিল। ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে তাকে ছাড়া কারের আর চলেই না। কারের সুপারিশেই রাজা ১৬০৮ সালে ওভারবারীকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করলেন। পরবর্তীকালে কার যখন ফ্রান্সিস হাওয়ার্ড নামে বিবাহিতা এক মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল, তখন কিন্তু ওভারবারীই ঐ মেয়েকে পাঠানো কারের প্রেমপত্রগুলি সুন্দর ভাবে লিখে দিত। এতই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল কার তার সেক্রেটারীর ওপর।

মাত্র ১৫ বৎসর বয়স্কা অসামান্যা সুন্দরী ফ্রান্সিস হাওয়ার্ড ছিল আর্ল অব সাফোক (Earl of saffolk) এর অতি আদরের কন্যা। নাবালিকা অবস্থায়ই তাকে আর এক অভিজাত পরিবারের সন্তান 'আর্ল অব এসেক্সের' সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু বিয়ের পর পরই তার স্বামী বিদেশে চলে যায় কয়েক বছরের জন্য। তাই

বিয়ের পরও তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বেশিদিন ঘরসংসারের সুযোগ হয়নি।

১৯১০ সালে হাওয়ার্ডের বয়স যখন পনের বৎসর তখন একদিন তার পিতা আর্ল মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রাজপ্রাসাদে এলেন একটি রাজকীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সেখানে মেয়ের অনিন্দ্যসুন্দর যৌবন দেখে রাজ দরবারেও সাড়া পড়ে যায়। রবার্ট কার তাকে দেখে মুগ্ধ হয় ও সেদিন থেকেই সে হাওয়ার্ডের প্রেমে পড়ে যায়। হাওয়ার্ড কিন্তু তখনো অনাঘ্রাত ফুল। আবার এদিকে রাজা জেমসের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স হেনরীও তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। তবে যুবরাজের এই বাসনা কিন্তু রাজা জেমসের মোটেই মনঃপূত হয়নি। এছাড়া আরও কয়েকটি ব্যাপার নিয়ে ঐ পুত্রের সঙ্গে রাজার তখন ভয়ানক মন কষাকষি চলছিল। এরপর হঠাৎ একদিন আকস্মিকভাবে প্রিন্স হেনরী মারা গেল। ১৬১২ সালে তার এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ কিন্তু রহস্যাবৃতই থেকে গেল। রাজাও এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। অনেকে বলে রাজা হেনরীর প্ররোচনাতেই অবাধ্য যুবরাজকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। আবার কেউ বলে সে হঠাৎ কঠিন টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

যাহোক তার মৃত্যুতে কার হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো,—ভাবলো তার প্রেমের পথ এবার নিষ্কণ্টক হলো। এরপর মিসেস হাওয়ার্ডের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা শুরু করে এবং এই সময় সে তার কৌমার্যও হরণ করলো।

এমন সময় দেখা দিল আর এক বিপত্তি। হাওয়ার্ডের প্রবাসী স্বামী আর্ল অবএসেক্স এসময়ে হঠাৎ একদিন ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলো।

বিদেশে যাওয়ার আগে তার স্ত্রী হাওয়ার্ডকে সে দেখে গেছে ছোট্ট একটি লাজুক মেয়ে। সে-সময় তার প্রতি সে কোনো আকর্ষণই বোধ করেনি। কিন্তু এতদিন পর দেশে ফিরে সেই হাওয়ার্ডেরই রূপ, লাবণ্য ও যৌবন দেখে সে আশ্চর্য ও উল্লসিত হয়ে উঠলো। তার নাবালিকা স্ত্রী যে এরই মধ্যে এত সুন্দরী হয়ে উঠেছে তা কিন্তু আর্লের কল্পনারও বাইরে ছিল। অতঃপর আর্ল তার স্ত্রীকে নিজের দেশের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু হাওয়ার্ড বেঁকে বসলো। সে তখন কারের প্রেমে মশগুল। তাকে ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কথা হাওয়ার্ড চিন্তাও করতে পারে না। কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া যায় কিভাবে? মরিয়া হয়ে সেই পথ খুঁজতে লাগলো কার ও হাওয়ার্ড।

সে-যুগে ইংল্যাণ্ডে ঝাড়, ফুঁক ও মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল বহু লোক। মিসেস টার্নার নামে এক ডাইনী মহিলা (Witch) তার মন্ত্রবলে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে বলে শোনা যেতো। তাই কারের সঙ্গে পরামর্শ করে হাওয়ার্ড গোপনে এসে মিসেস টার্নারের শরণাপন্ন হলো ও তাকে মনের সব কথা খুলে বললো, এখন পর্যন্তও সে তার স্বামীকে তার কাছ থেকে দূরে রাখতে পেরেছে, কিন্তু আর বোধহয় তা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ উভয় পক্ষের সব আত্মীয়স্বজন খুব চাপ দিচ্ছে তাকে স্বামীর সঙ্গে বসবাসের জন্য। কিন্তু হাওয়ার্ড যে তার দেহ-মন এরই মধ্যে আর একজনকে সঁপে দিয়েছে। এখন সে কিছুতেই কারকে ছেড়ে স্বামীর অঙ্কশায়িনী হতে রাজি নয়।

সব শুনে ডাইনী টার্নার উপদেশ দিল,—এই সংকট থেকে হাওয়ার্ডের মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে তার স্বামীকে কিছুকালের জন্য ওষুধের সাহায্যে পুরুষত্বহীন করে ফেলা। এতে হাওয়ার্ডের লাভ

Mamun Academy

হবে দ্বিবিধ—প্রথমত লোক দেখানোর জন্য স্বামীর কাছে থাকলেও তার অসুবিধার কারণ থাকবে না, আবার এই কারণ দেখিয়েই সে স্বামীর কাছ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে তার প্রেমিক কারকে বিয়ে করতে পারবে।

এই প্রস্তাব খুব পছন্দ হলো হাওয়ার্ড ও কারের। এ কাজ সমাধা করার ভার ডাইনী টার্নারের উপরই তারা অর্পণ করলো। বিনিময়ে তারা বহু অর্থ দিতে রাজি হলো অর্থলোভী টার্নারকে। টার্নার গোপনে হাওয়ার্ডকে কিছু ওষুধপত্র ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দিল। হাওয়ার্ড তার স্বামীর চাকরদের অর্থ দিয়ে বশীভূত করে আর্লের খাবারের সঙ্গে গোপনে ঐসব ওষুধপত্র মিশিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে ফেললো। ফলে শিগগিরই আর্ল স্ত্রী সহবাসের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেললো। এরপর থেকে স্বামী-স্ত্রী এক বিছানায় থাকলেও ঐ ওষুধের বিষক্রিয়ায় আর্লের অক্ষমতার জন্য তাদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক সফল হতে পারলো না।

কিন্তু স্ত্রীকে তালাক দিতে আর্লকে রাজি করানো গেল না, ফলে কারের সঙ্গে হাওয়ার্ডের বিয়েও সম্ভব হচ্ছিল না। অতঃপর হাওয়ার্ড মরিয়া হয়ে ক্যানিং ম্যারি নামের এক মেয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে গোপনে তাকে অনুরোধ করলো বিষের সাহায্যে তার স্বামীকে মেরে ফেলবার ওষুধ দিতে। ক্যানিং ম্যারি যদিও এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত ছিল, তবু এত অল্প বয়সের একটি মেয়ের কাছ থেকে সে এ রকম একটি প্রস্তাব আশা করেনি। বিশেষভাবে তার যুবক স্বামী আর্ল অব এসেক্সের মতো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে হত্যা করার প্রস্তাবে। সে তাকে সাহায্য তো করলোই না, বরং তাকে ভৎর্সনা করে তাড়িয়ে দিল। রেগে গিয়ে হাওয়ার্ড এই অপমানের প্রতি-

Mamun Academy

শোধ নেবে বলে ডাক্তারকে শাসালো। কারের সাহায্যে ডাক্তারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও সে উদ্যোগী হলো।

ক্যানিং ম্যারীও সোজা মানুষ নয়। এই খবর পেয়ে সে হাওয়ার্ডকে সোজা জানিয়ে দিল যে তাহলে সে-ও হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে। অর্থাৎ নিজ স্বামীকে হত্যা করার যে জঘন্য প্রস্তাব নিয়ে সে তার কাছে এসেছিল তা সে বাইরের সবার কাছে প্রকাশ করে দেবে। হাওয়ার্ড এতে ভয় পেয়ে গেল। ম্যারির বিরুদ্ধে এরপর সে আর অগ্রসর হয়নি।

১৬১৩ সালে 'কার'-এর আমন্ত্রণে স্বামী-স্ত্রী আর্ল ও হাওয়ার্ড কিছুদিন রাজপ্রাসাদে এসে কাটালো। সেই সুযোগে কার বেশ কয়েকদিন তার প্রেমিকাকে উপভোগ করলো। হাওয়ার্ড তার স্বামীকে স্ত্রী হয়েও যা দেয়নি তাই সে তখন তার প্রেমিক কারকে দিল নির্দ্বিধায়।

ব্যাপারটা কিন্তু এর মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল। অন্দর মহলে এ নিয়ে প্রথমে কানাঘুষা ও পরে রসালাপও শুরু হলো। আর্ল, হাওয়ার্ড ও কারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনেরা সমস্যাটির গুরুত্ব অনুভব করলো।

হাওয়ার্ডের বড় চাচা আর্ল অব নর্দামটন ছিলেন একজন নামকরা লোক। রাজপরিবারেও তাঁর প্রভাব ছিল প্রচুর। তিনি ভাবলেন এ অবস্থায় সবচেয়ে ভালো হয় যদি হাওয়ার্ড তার বর্তমান স্বামী আর্লের কাছ থেকে ডিভোর্স নিয়ে পরে তার মনের মানুষ রবার্ট কারকেই বিয়ে করে। এদিকে তখন কারের আধিপত্য আরও বেড়ে গেছে। রাজা তখন তাকে 'ডিউক অব সমার সেট' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এ ছাড়া ইংল্যাণ্ডের 'লর্ড ট্রেজারার' হিসেবেও সে

Mamun Academy

কাজ করছিল। ফলে বিপুল সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েছে তখন রবার্ট কার।

মেয়ের চাচা আর্ল ভাবলেন তার প্রস্তাব কার্যকারী হলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে—অর্থাৎ অশান্ত মেয়েটারও একটা সুরাহা হবে, আবার তার মাধ্যমে রবার্ট কারের মতো একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকেও হাত করা যাবে। এতে সে নিজে রাজপরিবারে আরও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাবে।

কিন্তু সেই যুগে ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের পক্ষে তালাক নেয়া ছিল খুব কঠিন ব্যাপার। হিন্দুদের মতো তারাও তখন পবিত্র বিবাহ বন্ধনকে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করতো। আর চার্চের প্রভাবও জনসাধারণের উপর ছিল প্রবল।

প্রথমে রাজার কাছে হাওয়ার্ডের চাচা এই প্রস্তাব পাড়লেন। রাজা জেমসও সব শুনে তাতে সম্মতি দিলেন। এরপর স্বামী আর্লকে ধরা হলো। যদিও সবাই জানতো যে বেচারা আর্লের উপরই একের পরএক অবিচার করা হচ্ছে, তবুও আর্ল সবদিক বিবেচনা করে তার স্ত্রী হাওয়ার্ডকে তালাক দিতে রাজি হলো। তৎকালীন শক্তিশালী ও গোঁড়া চার্চকে (ধর্মযাজককে) সম্মত করার জন্য, তালাকের কারণ হিসেবে নিজেকে সে স্ত্রী সহবাসে অসমর্থ বলে ঘোষণা করতেও স্বীকৃত হলো। তবুও শেষ রক্ষা বুঝি হলো না।

ক্যান্টারবেরীর আর্চ বিশপ বেঁকে বসলেন। তিনি এরকম বিবাহ বিচ্ছেদে স্বীকৃতি দিয়ে দেশে একটি খারাপ নজির উপস্থাপন করতে পারবেন না বলে প্রথমে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন। আর কোনো উপায় না দেখে কারের চাপে পড়ে রাজা জেমস নিজে আর্চ বিশপকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজি করা-

লেন।

কিন্তু এরপরও এমন একজনের কাছ থেকে শেষ মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত বাধা এলো যার কথা এর আগে ওরা কেউ চিন্তাও করেনি। সেই বাধাদানকারী ব্যক্তি আর কেউ নয়, কার-এর সেক্রেটারী স্যার টমাস ওভারবারী। সে নিজে প্রথম দিকে হাওয়ার্ডকে লেখা কারের সুন্দর প্রেমপত্রগুলি লিখে দিতো এবং এই রোমান্সে প্রথম থেকেই কারের একজন সহযোগী ও উৎসাহদাতা ছিল। এ সময় হঠাৎ এভাবে তার বেঁকে বসবার কি কারণ থাকতে পারে তা বুঝতে পারছিল না কার ও তার প্রেমিকা। ধূর্ত ওভারবারী জানতো যে এই মনোভাবের জন্য তার সমূহ ক্ষতি এমন কি জীবনও বিপন্ন হতে পারে। কোন্ পথে গেলে নিজের উন্নতি হবে আর কোন্ পথ কণ্টকাকীর্ণ সে জ্ঞান বরাবরই তার ছিল টনটনে। কিন্তু তবুও শেষ মুহূর্তে তার এহেন আচরণের অর্থ কি?

অবশ্য হাওয়ার্ডকে ওভারবারী কখনো মন থেকে পছন্দ করতো না। তবু এ সময় তার এই অস্বাভাবিক মনোভাবের কারণ বোধহয় তার সমকামী মনোভাব ও কারের সঙ্গে তার এক কালের কুসম্পর্ক। সমকামী প্রেমে মনে হয় সে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রাখতে রাজি ছিল না।

হাওয়ার্ডের ব্যাপার নিয়ে ওভারবারী সেদিন তার অফিসে প্রভু কারের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করলো। সে এই তালাক ও কারের সঙ্গে হাওয়ার্ডের আবার বিবাহ কিছুতেই হতে দেবে না বলে জানালো। রাজা জেমস সব শুনে ঠিক করলেন এমতাবস্থায় ওভারবারীকে দূরে সরিয়ে দেয়াই ভালো। তিনি তাকে ফ্রান্সে অথবা মস্কোতে পররাষ্ট্র দপ্তরে কূটনৈতিক পদে নিয়োগ করতে চাইলেন। কিন্তু ওভারবারী এই উভয় প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করলো। রাজা রাগান্বিত হয়ে

Mamun Academy

তাকে তখন টাওয়ারে বন্দী করার আদেশ দিলেন।

ওভারবারী যাতে আবার রাজার অবাধ্য না হয়ে এই আদেশ সহজে মেনে নেয়, সেই চেষ্টায় কার নিজেই এলো তাকে বুঝিয়ে বলতে। সে ওভারবারীকে আশ্বাস দিল যদি সে বিনা দ্বিধায় রাজার আদেশ মেনে নেয়, তবে রাজার এই ক্ষণিকের রাগ সহজেই প্রশমিত হবে। আর তারপরেই ওভারবারীর ভাগ্য আবার সুপ্রসন্ন হবে। তাকে সে আরও আশা দিল যে সামনে একটি বিরাট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ ওর জন্য অপেক্ষা করছে, এ ব্যাপারে কার তার সাধ্যমত সবকিছু করার প্রতিশ্রুতিও প্রদান করলো।

অগত্যা ওভারবারী রাজি হলো রাজদণ্ডাদেশ মেনে নিতে। কিন্তু তখন সে ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি যে এভাবে সে কারের পাতা এক গভীর ফাঁদে পা দিল। কারণ কার ও তার প্রেমিকা এতই মরিয়া হয়ে উঠেছিল যে তাদের মিলনের পথের সমস্ত বাধা তারা নিষ্ঠুর হাতে চিরতরে দমন করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল।

রাজা জেমস কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওভারবারীর কোনো গুরুতর ক্ষতি করতে চাননি। তার প্রতি রাজার কোনো বিদ্বেষও ছিল না। তিনি শুধু রাজ আদেশ অমান্যের জন্য তাকে কিছুদিনের শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। রবার্ট কার ও ফ্রান্সিস হাওয়ার্ড কিন্তু তাদের সংকল্পে অটল রইলো। হাওয়ার্ডের চাচা আর্ল অব নর্দামটনের চেষ্টাতেই তাদের একান্ত বাধ্য ও অনুগত স্যার গার্ডাস এলিস নামের এক ধনীর নির্বোধ সন্তানকে তখন সেই বন্দীশালা লণ্ডন টাওয়ারের গভর্ণর নিয়োগ করা হয়েছিল। আবার সেই সঙ্গে তাদের চেষ্টাতেই সেই ডাইনী মহিলা মিসেস টার্নারের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওয়েটসনকে টাওয়ারে বন্দী ওভারবারীকে দেখাশুনার কাজে নিয়োগ করা

Mamun Academy

হলো। এরা সবাই মিলে এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। পরবর্তী দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে বন্দী ওভারবারীর খাদ্য ও মাংসের সঙ্গে অল্প ডোজে বিষ মিশিয়ে দিয়ে তাকে আস্তে আস্তে মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। ঐ বিষ মিসেস টার্নারই গোপনে সংগ্রহ করে আনতো ডাঃ ফ্রাঙ্কলিন নামক তার এক বন্ধুর কাছ থেকে। ওভারবারীর দেখাশুনার ভারপ্রাপ্ত ওয়েটসন নিজেই খাদ্যে বিষ মেশাবার কাজটি করতো। টাওয়ারের বোকা গভর্ণর স্যার এলিস কিন্তু প্রথমে বুঝতেই পারেনি যে কি ঘটছে, আর কেনই বা ওভারবারী বিনা কারণে দিন দিন নির্জীব হয়ে পড়ছে। পরে যখন বিষ ক্রিয়ার প্রকৃত রহস্য তার অনুগত কর্মচারী মারসটন জানতে পারলো তখনো কিন্তু সে তা রোধ করার চেষ্টা করেনি। মনে হয় টের পেয়ে রবার্ট কার তাকেও টাকা দিয়ে বাধ্য করে ফেলে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই কারণে তাকেও চরম মূল্য দিতে হয়েছিল।

মারসটন নামের এক তরুণ সঙ্গীতজ্ঞ ঘটনাক্রমে টের পেয়ে গেল যে ওভারবারীকে বিষ প্রয়োগ করে ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সে মুখ খুলবার আগেই, এ কথা জানতে পেরে কারের লোকেরা ঘুষ দিয়ে তার মুখও বন্ধ করে ফেললো। ঠিক এইভাবেই আরও কয়েকজন সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিকে শান্ত করা হলো।

দীর্ঘদিন প্রচণ্ড বিষের জ্বালা বুকে নিয়ে শেষপর্যন্ত ১৬১৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ওভারবারী টাওয়ারের বন্দীশালায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। মৃত্যুর খবর পেয়ে তার পিতামাতা ওয়ার্ক উইকশায়ার থেকে ছুটে এলেন পুত্রের লাশ নিয়ে সৎকার করতে। কিন্তু তারা এসে নিরাশ হয়ে দেখলেন যে মৃত্যুর পরপরই খুব তাড়াহুড়া

Mamun Academy

করে বারীর মৃতদেহ আগেই সমাহিত করা হয়েছে।

এবার শেষ বাধা দূর হয়েছে দেখে পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী হাওয়ার্ড তার স্বামী আর্লের কাছ থেকে তালাক নিয়ে আবার মিস হয়ে গেল। তারপর মহা ধুমধামের সঙ্গে রবার্ট কার হাওয়ার্ডকে বিয়ে করলো। বহু গণ্যমান্য লোক ঐ বিবাহ উৎসবে যোগ দেয়। সেই যুগের স্বনামধন্য ব্যক্তি ও সুলেখক স্যার ফ্রান্সিস বেকন ঐ বিবাহ উৎসবে পৌরহিত্য করেন।

এভাবে অনেক খড়কুটো পুড়িয়ে কার শেষ পর্যন্ত তার প্রেয়সীকে পেল বটে, কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাদের অচিরেই শুরু হয়ে গেল। এর পর থেকেই কারের অধঃপতনের শুরু। এবারই সে প্রথম টের পেতে শুরু করলো যে মৃত ওভারবারী বাস্তবিকই তার একজন অতি অনুগত ও দক্ষ প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিল। এখন আর কাউকে দিয়েই সেই অভাব পূরণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া বারীর দক্ষতার কল্যাণে সে নিজেও সব কাজ ভালোভাবে শেখেনি বা শেখার চেষ্টাও করেনি। এখন তার অবর্তমানে সে তার অভাব হাড়ে হাড়ে টের পেতে লাগলো।

রাজা অবশ্য তার জন্য আর একজন নতুন সেক্রেটারী নিয়োগ করে দিলেন। কিন্তু তাকে কারের মোটেই পছন্দ হলো না। তার সঙ্গে কারের হরদম ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকতো। এমন কি তাকে নিয়ে কার রাজার সামনেই হৈ চৈ করে এমন সব মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করতো যা রাজার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। অথচ কার তখনো বুঝতে পারছিল না যে রাজা তার কাছে প্রধানত মানসিক নিরাপত্তাই আশা করেছিলেন। মাঝে মাঝে কার রাজার উপর মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে বাধা পেলে পাগলের মতো

Mamun Academy

হয়ে গিয়ে রাজার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে ফেলতো। ওভারবারী বেঁচে থাকতে সে তখন এসব সামলে নিত ও তার বিজ্ঞ উপদেশ দিয়ে সে রাজা ও কারের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে দিত। কার বুঝতে পারলো নিজের দোষেই সে আজ তার কতবড় একটি অবলম্বন হারিয়েছে! কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে।

কথায় বলে বিপদ একা আসে না—যখন আসে তা চারদিক দিয়েই আসে। এসময় কারের ভাগ্যাকাশ আরও মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো কারণ রাজা আবিষ্কার করলো আর এক সুন্দর তরুণ পাত্র। সে ছিল ক্যাম্ব্রিজের ছাত্র, নাম ভিলিয়ার্স। শিগগিরই বোঝা গেল এই তরুণই এখন রাজার সমকামের ইন্ধন যোগাচ্ছে। দিবা-রাতের সঙ্গী হিসেবে ভিলিয়ার্স রাজার খুব প্রিয় পাত্র হয়ে অচিরেই কারের স্থান দখল করে নিল, ফলে কারের দুর্ভাগ্য আরও ঘনিয়ে এলো।

কিন্তু তবুও কার তার পদমর্যাদা ঠিক রাখতে পারতো যদি সে বাস্তব অবস্থা মেনে নিয়ে সতর্ক হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতো ও রাজাকে সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করতো। কিন্তু সেই ধৈর্য ও বুদ্ধি টমাস কারের ছিল না। আর পরিণামে সেটাই হলো তার অধঃপতনের মূল কারণ।

কার-হাওয়ার্ডের বিবাহের দেড় বৎসর পরে ক্লাশিং নামক স্থানে এক যুবক তার মৃত্যুর পূর্বে এক চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ করে যে টাওয়ারে বন্দী অবস্থায় ওভারবারীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি, —অল্প ডোজে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে তাকে ধীরে ধীরে হত্যা করা হয়েছে। আর যে কেমিস্ট অর্থের বিনিময়ে ঐ বিষ সরবরাহ করতো, তারই সহকারী হিসেবে মৃত্যুপথযাত্রী ঐ যুবকই প্রয়োগ করতো ওভারবারীর খাদ্যে 'মারকিউরিক সাবলিমেট (Mercuric Subli-

mate) নামক মারাত্মক বিষের ডোজ। যুবক তার স্বীকারোক্তিতে বলে যে সেই থেকে এ পর্যন্ত বিবেকের দংশনে সে অহরহ ভুগছে। তাই তার মৃত্যুর পূর্বে পাপের ভার লাঘব করার জন্য সে পৃথিবীটাকে ঐ সত্যি কথা জানিয়ে যাচ্ছে যাতে সে অন্তত মরেও শান্তি পেতে পারে।

এই স্বীকারোক্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে এক হৈ চৈ পড়ে গেল। রাজার কাছেও পাঠানো হলো রেকর্ড করা ঐ স্বীকারোক্তি। রাজা তা দেখেশুনে বিস্ময়ে হতবাক। বুঝতে পারলেন এর পেছনে ঘনিষ্ঠ মহলের এক গভীর ষড়যন্ত্র ছিল। রাজা তৎক্ষণাৎ স্যার এডওয়ার্ড কোক নামের এক সম্ভ্রান্ত, কঠোর ও সৎ কর্মচারীর উপর এর তদন্তের ভার দিলেন। সেই সঙ্গে রাজা তাকে এ ক্ষমতাও দিলেন যে, এ ব্যাপারে এডওয়ার্ড যে কোনো ব্যক্তিকে—তা সে যত উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাসম্পন্নই হোক না কেন, তাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রয়োজন বোধে তাকে গ্রেফতারও করতে পারবেন।

স্যার এডওয়ার্ডের নিরপেক্ষ ও বিশদ তদন্তের ফলে ক্রমে ক্রমে এতদিনের সব গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গেল। একে একে ধরা পড়লো টাওয়ারের তৎকালীন গভর্ণর স্যার গার্ডাস এলিস, ডাইনী মহিলা মিসেস টার্নার, ওভারবারীর খাদ্য পরিবেশনকারী ওয়েটসন ও বিষ সাপ্লাইকারী ডাঃ ফ্রাঙ্কলিন। তদন্ত শেষে এদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে নরহত্যার চার্জ আনা হলো। ঐতিহাসিক এই বিচারে এদের সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। ১৬১৫ সালের শরৎ কালে ঐ মৃত্যুদণ্ড কার্যকারী করা হয়।

স্বাভাবিকভাবেই এবার রবার্ট কার ও তার স্ত্রী ঘাবড়ে গেল। কার জানতো যে তখনও একটি গোপন কক্ষে তাদেরকে লেখা

মিসেস টার্নারের এমন কতকগুলো গোপন চিঠিপত্র রয়ে গেছে যা পাওয়া গেলে তাদেরও নিস্তার থাকবে না। অথচ সেই ঘরে ঢুকবার কোনো সুযোগ তারা পাচ্ছিল না। অবশেষে একদিন মরিয়া হয়ে কার গোপনে রাজার সীলমোহর ব্যবহার করে তার আদেশের দোহাই দিয়ে সেই ঘরে ঢুকে কয়েকটি ম্যারাত্মক কাগজপত্র বিনষ্ট করে ফেললো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এরপরই আরও কিছু গোপনীয় কাগজপত্র বেরিয়ে পড়ে যা স্যার এডওয়ার্ড কোকের হস্তগত হয়। এসব দেখে সঙ্গে সঙ্গে স্যার এডওয়ার্ড কার ও তার স্ত্রী হাওয়ার্ডকে গ্রেফতারের আদেশ দিলেন। কার যখন রাইসটনে রাজার সঙ্গে কথা বলছিল তখনই স্যার এডওয়ার্ডের গ্রেফতারী পরোয়ানা তার কাছে গিয়ে পৌঁছুলো। তা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে কার পরোয়ানা বাহককে জানালো যে সে এডওয়ার্ডের আদেশ মানবে না। ভেবেছিল রাজা বোধ হয় তাকে আশ্রয় দেবেন।

কিন্তু রাজা জেমস এডওয়ার্ডের পরোয়ানা একনজর দেখে নিয়ে কারের দিকে চেয়ে বললেন,—'না কার; এ আদেশ তোমাকে মানতেই হবে। এমন কি এডওয়ার্ড যদি এখন আমাকেও এ শমন পাঠাতো তবে আমিও তা বিনা দ্বিধায় মানতে বাধ্য হতাম।'

রাজার মুখে এ কথা শুনে শুষ্ক মুখে তার দিকে হতাশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে কার বললো, 'তাহলে আপনিও আমাকে যেতে বলছেন? কোনো বিপদ হবে না তো আমার? ফিরে আসতে পারবো তো আবার?'

রাজা তাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'কোনো দুশ্চিন্তা করো না, কার। শিগগিরই তুমি আবার ফিরে আসবে।' যাবার আগে রাজা তাকে আন্তরিকভাবে করমর্দন করে বিদায় দিলেন। তারপর ওর

Mamun Academy

যাবার পথের দিকে চেয়ে রাজাকে পুনরায় বলতে শোনা গেল,—'আর বোধহয় আমি তোমার মুখ দেখতে পাবো না—তোমার জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত।'

হাওয়ার্ডকেও এ ভাবেই বন্দী করা হলো। বন্দী অবস্থাতেই সে ১৬১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এক ফুটফুটে কন্যা সন্তান প্রসব করলো। কিন্তু পরবর্তী মার্চ মাসের মধ্যেই বাচ্চাকে মার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হলো। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত সম্পূর্ণ হবার পর ২৪শে মে ওয়েস্ট মিনিস্টার হলে তাদের বিচার শুরু হলো। গ্রহের ফেরে আজ আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে এককালের রাজার একান্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ও সহচর রবার্ট কার, সেই সঙ্গে তার স্ত্রী ফ্রান্সিস হাওয়ার্ড। ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিত ভাবে ওভারবারীকে হত্যার অভিযোগে তারাও আজ অভিযুক্ত। কোর্টে তিল ধারণের স্থান নেই। সমগ্র লণ্ডন শহর আজ ভেঙে পড়েছে এই ঐতিহাসিক বিচার দেখতে।

এবার স্যার ফ্রান্সিস বেকন (যিনি কারের বিবাহে পৌরহিত্য করেছিলেন) সরকার পক্ষের প্রধান কৌঁসুলী হিসেবে এই মামলা পরিচালনা করেন।

মিসেস ফ্রান্সিস হাওয়ার্ড কিন্তু বিচারের প্রথম দিকেই তার সমস্ত দোষ স্বীকার করে নিল। ভেতরের সব রহস্য তার মুখেই প্রকাশিত হলে সবাই আশ্চর্য হলো এই ভেবে যে, ভদ্রঘরের এই তরুণীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখের পশ্চাতে লুকিয়ে আছে কি বীভৎস এক কালনাগিনী যে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিবেক, ধর্ম ও সমাজের সব অনুশাসন জলাঞ্জলি দিয়ে একের পর এক জঘন্য পাপ করতে একটুও দ্বিধা করেনি।

Mamun Academy

বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো।

রবার্ট কার কিন্তু নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করলো। এবার তার বিচার শুরু হবে বলে কোর্ট ঘোষণা করলো। কার তখন রেগে গিয়ে সেখানেই চিৎকার করে বললো,—'স্বয়ং রাজারও সাধ্য হবে না আমাকে এভাবে বিচার করতে।' সে হুমকি দিয়ে আরও জানালো যে, যদি তার বিচার শুরু করাই হয় তবে সে এমন কতগুলো অতি গোপনীয় ব্যাপার ফাঁস করে দেবে যার দরুন স্বয়ং রাজাকেই বিপদে পড়তে হবে।

তার এই হুমকি রাজার কানে গেলে রাজাও বেশ ঘাবড়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন কার হয়তো প্রকাশ্য আদালতে বলে দেবে তার সঙ্গে রাজার অস্বাভাবিক সমকামের কথা। এছাড়া তার পুত্র হেনরীর মৃত্যুর গোপন কথাও সে হয়তো প্রকাশ করে দেবে। অথচ এখন বিচার কার্য স্থগিত রাখাও যায় না। রাজা তখন আর কোনো উপায় না দেখে সেই রাতেই গোপনে কারের কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে কথা দিলেন যে বিচারে কোর্ট কারকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও রাজা তা কার্যকারী করতে দিবেন না—যদি কার ঐসব গোপন ব্যাপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থাকে। আর তা না হলে কেউ কারের মৃত্যুদণ্ড ঠেকাতে পারবে না।

অনেক ভেবে প্রাণের মায়ায় কার তা মেনে নিল।

পরদিন আবার তার বিচার শুরু হলো। আসামীকে বিশ্বাস নেই। কোর্টে আবার রাগের মাথায় যাতে সে কোনো বেফাঁস কথা বলে না ফেলে সেজন্য বিচারের সময় সর্বক্ষণ দুজন লোক কাপড় হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো তার দুপাশে যাতে প্রয়োজন বোধে ঐ কাপড় জড়িয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেয়া যায়।

Mamun Academy

বিচারে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আসামী কারকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো।

এই ট্র্যাজেডীর শেষ অধ্যায় কিন্তু ছিল আরও করুণ, আরও মর্মস্পর্শী।

রাজা জেমস অবশ্য তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মৃত্যুদণ্ড রাজা রদ করে তাদের যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দেন। তাদের দুজনকেই অতঃপর সেই লণ্ডন টাওয়ারে বন্দী করে রাখা হলো। কিন্তু এরই মধ্যে তাদের এতদিনের প্রেম ভালোবাসা সবই কর্পূরের মতো উবে গেছে। অথচ এই ভালোবাসার পথই নিষ্কণ্টক করার জন্য এককালে তারা জঘন্য পাপাচার এমন কি নরহত্যায়ও লিপ্ত হয়েছিল।

এরপর দীর্ঘ ছয় বৎসর কার ও ফ্রান্সিস উভয়ে টাওয়ারে বন্দী জীবনযাপন করেছিল। রাজার আদেশে সেখানে তাদের একই ঘরে থাকতেও দেয়া হয়েছিল। এমন কি বন্দী অবস্থায় তাদের গ্রামের বাড়ি গ্রে-তে গিয়েও কিছুদিন একসঙ্গে কাটাবার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরের কি অপূর্ব লীলাখেলা যে এই দীর্ঘ সময়ে তারা এমন কি পরস্পরের সঙ্গে ভালো করে কথাও বলেনি। কোথায় গেল তাদের প্রেম ভালোবাসা! অতীতের পাপের অনুশোচনা, দারিদ্র্য, বাস্তবতা ও সর্বোপরি বিবেকের কঠিন কশাঘাতে এত কাছে থেকেও তখন তারা একে অপরকে একটুও সহ্য করতে পারতো না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া একে আর কি বলা যায়!

এই বন্দীদশা হাওয়ার্ডের জীবনই বেশি বিষময় করে তুললো। এই অনভ্যস্ত পরিবেশ ধীরে ধীরে তার শরীরের ওপর বিষ ক্রিয়ার মতো তার জীবনীশক্তি ক্রমে ক্রমে হরণ করে চললো। মনে হয়

তার পেটে এ সময় দুরারোগ্য ক্যান্সারের আক্রমণ হয়। আস্তে আস্তে সে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যেতে লাগলো। এ সময়ও কিন্তু সে কারের সাহচর্য সহ্য করতে পারতো না।

জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়ে একদিন হাওয়ার্ড তার অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ করলো তার প্রথম স্বামী আর্ল অব এসেক্সকে দেখ-বার জন্য।

খবর পেয়ে আর্ল ছুটে এলো ওর শয্যাপার্শ্বে।

ওকে দেখেই হাওয়ার্ড ওর দুহাত জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে বললো,—'আমি আর বাঁচবো না—আমি মহাপাপী—তোমার সঙ্গেই আমি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি—যার ফলে তোমার ও আমার উভয়ের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো—না হলে মরেও শান্তি পাবো না আমি।'

হাওয়ার্ডের মাথায় হাত রেখে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে সেদিন আর্ল বলেছিল—'সত্যিই আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি। আজ আমার আর কোনো অভিযোগ নেই তোমার বিরুদ্ধে।'

'তুমি মহৎ—তুমি উদার—ভগবান তোমার ভালো করুন। এখন আমার মরণেও শান্তি—তুমি আমার জন্য দোয়া করো।' এই বলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো ফ্রান্সিস হাওয়ার্ড।

রবার্ট কার অবশ্য এরপর আরও কয়েক বৎসর বেঁচে ছিল। তখন তার জীবনে একমাত্র আনন্দ ছিল হাওয়ার্ডের রেখে যাওয়া তাদের ছোট্ট ফুলের মতো মেয়েটির সঙ্গ। বড় হয়ে সেই মেয়ের বিয়ে হয় উচ্চ ঘরে—ডিউক অব বেডফোর্ডের(Bedford) সঙ্গে। শেষ বয়সে কার একবার রাজা জেমসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়। রাজা তখন তার শারীরিক ও মানসিক দুরবস্থা দেখে কান্নায় ভেঙেপড়েন।

সেদিন ওর কাঁধে মাথা রেখে রাজা বহুক্ষণ ধরে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

এই বিচিত্র নাটকের আর এক নায়ক হাওয়ার্ডের চাচা আর্ল অব নর্দামটন কিন্তু ১৬১৪ সালে অর্থাৎ কার-হাওয়ার্ডের বিয়ের পর বৎসরই মারা যায়। তাই তার ক্ষমতা দখলের প্ল্যানের ব্যর্থতা ও সেই পাপে সাত-সাতটি মূল্যবান জীবনের শোচনীয় পরিণতি তাকে দেখে যেতে হয়নি।

Mamun Academy

অবৈধ প্রেমের শিকার

খাওয়া দাওয়া সেরে সেদিন রাতে ওমর আলী তার শ্বশুর বাড়ির একটি কামরায় ঘুমাতে যায়। তার স্ত্রী জাহানারা বেগম ওরফে পারুলও রাত্রে ঐ ঘরে থাকে। ঘরের বারান্দায় পারুলের মা পান্না বিবি বাচ্চাদের নিয়ে ঘুমায়।

গভীর রাতে পান্না বিবির ঘুম ভেঙে যায়। ভারি কোনো জিনিসের পতনের শব্দ সে শুনতে পেল। মনে হলো মেয়ের ঘর থেকেই ঐ শব্দ এলো। চেয়ে দেখে মেয়ে-জামাইএর ঘরের দরজা খোলা। উঠে এসে হারিকেনের ফিতা ঘুরিয়ে আলো বাড়িয়ে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে সে মেয়ের ঘরের কাছে এসে তার নাম ধরে ডাকলো। কিন্তু কোনো সাড়া মিললো না। হারিকেন হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকেই বিস্ময়ে হতবাক পান্না বিবি দেখতে পেল তার জামাই ওমর আলী রক্তাক্ত শরীরে ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। আর পান্না বিবির পাশ কাটিয়ে ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল একজন লোক। তার হাতে ছিল একটি রক্তাক্ত 'গাছিদা'। লোকটিকে ওমরের চাচাতো ভাই আবু বকর বলেই পান্না বিবির সন্দেহ হলো।

ঐ বীভৎস দৃশ্য দেখে পান্না বিবি চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। তা শুনে আশপাশ থেকে লোকজন দৌড়ে এলো। তারাও দেখলো সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য—গলা কাটা অবস্থায় দারোগা ওমর আলী ঘরের

Mamun Academy

মেঝেতে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে গেছে সমস্ত ঘর, বিছানা ও কাপড় চোপড়।

ওমর আলী ছিল পুলিশের একজন সাব- ইন্সপেক্টর। সে-সময় সে খুলনা জেলায় চাকুরীরত ছিল। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে ছুটি নিয়ে সে তার গ্রামের বাড়ি যশোহর জেলার বাগর পাড়া থানার বড় খুরদায় আসে। উদ্দেশ্য কয়েকদিন বাড়ি থেকে, তার স্ত্রী ও দুই সন্তানের মাতা পারুলকে নিয়ে নিজ কর্মস্থলে ফিরে যাবে। স্ত্রী কিন্তু স্বামীর সঙ্গে খুলনা যেতে অনিচ্ছুক। এর আগেও কয়েকবার চেষ্টা করে ওমর আলী তার স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে যেতে পারেনি। এবার কিন্তু সে স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার দৃঢ় সংকল্প নিয়েই এসেছিল। এর একটি বিশেষ কারণও ছিল। ওমর আলীর চাচাতো ভাই আবু বকরের সঙ্গে তার স্ত্রীর অন্তরঙ্গ মেলামেশার কথা ওমর আলীর কানে গিয়েছিল। তাদের দেবর-ভাবীর মধুর সম্পর্ক শালীনতার বাঁধ ভেঙে আরও বহুদূর গড়িয়ে যে পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিল তা ওদের আত্মীয়স্বজন সবার চোখেই ভয়ানক দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছিল।

গত ছয় মাস ধরেই তাদের ঐ অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কয়েকদিন আগে ভাবী-দেবর অন্তরঙ্গ অবস্থায় মগ্ন থাকার সময় স্বয়ং ওমর আলীই তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে। সেদিন ওমর আলী ওদের দুজনকেই বেশ মারধোর করে। এরপর পারুল রাগ করে নিকটবর্তী তার বাপের বাড়ি ভগবানপুর চলে আসে।

ওমর আলী ঠিক করলো ১৯/৭/৭৮ তারিখ ভোরে সে তার স্ত্রী ও দুই বাচ্চা নিয়ে খুলনা রওনা হবে। যাওয়ার আগে শ্বশুর বাড়ি বেড়াতেই সে ঐ রাতে এখানে এসেছিল। আর সে-সময়ই ঘটলো

Mamun Academy

ঐ হত্যাকাণ্ড।

ভোর রাতেই মাইল দেড়েক দূরে ওমর আলীর বাড়িতে এই দুঃসংবাদ পৌঁছে গেল। তার সৎ বোন মজিনা এই খবর শুনে ভগবানপুর আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সে তার চাচাতো ভাই আবু বকরের কাছে ছুটে এসে তাকে এই দুঃসংবাদ জানিয়ে অনুরোধ করলো এখনই তাকে নিয়ে ভগবানপুর যেতে। আবু বকর তখনো বিছানায় শুয়ে ছিল। এ সংবাদ শুনে তাকে বিশেষ বিচলিত মনে হলো না। সে মজিনার প্রস্তাব এড়িয়ে গিয়ে বললো—'আমার শরীর খুব খারাপ। আরও কিছুক্ষণ না ঘুমালে আমি বিছানা থেকে উঠতেই পারবো না।' এই বলে সে পাশ ফিরে ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে রইলো। ওর তখনকার হাব-ভাব মজিনার কাছে রহস্যজনক মনে হলো।

অগত্যা মজিনা তার মা ও চাচাকে সঙ্গে নিয়ে ভগবানপুর ছুটে এলো। ওরা এসে দেখে বহু লোকের ভিড় জমে আছে সেখানে। ওমর আলীকে জড়িয়ে ধরে তখন ওরা সবাই কান্নায় ভেঙে পড়লো। পারুল ও তার মা পান্না বিবিই সে-রাতে মৃতের সবচেয়ে কাছে ছিল। সবাই গতরাতের কাহিনী শোনার জন্য তাদের ঘিরে ধরলো। ওরা দুজন সবাইকে বললো,—গভীর রাতে আবু বকর এক ধারালো গাছি দা নিয়ে ওদের ঘরে ঢুকে কুপিয়ে ওমর আলীকে হত্যা করেছে। অনেকে প্রশ্ন করে,—পারুল তখন কোথায় ছিল?

এ প্রশ্নে পারুল থতমত খেয়ে যায়—অসংলগ্ন উত্তর দেয় সে—এক এক সময় এক এক রকম বিবরণ দিয়ে। পারুলের কথাবার্তা শুনে ও হাবভাব দেখে সবার সন্দেহ শুধু আবু বকরের ওপরই নয়—স্ত্রী পারুলের ওপরও গিয়ে পড়লো।—আর আবু বকর ও পারুলের

সন্দেহজনক সম্পর্কের কথা তো প্রায় সবারই জানা ছিল।

মজিনার কাছে সবাই জানলো যে এই সংবাদ শুনেও আবু বকর বিছানায় শুয়ে আছে। সেখান থেকে কয়েকজন মাতব্বর গোছের লোক তখন ছুটে গেল আবু বকরের খোঁজে তার বাসায়। এসে দেখে আবু বকর তখনো বিছানায়।

আশ্চর্য হয়ে একজন প্রশ্ন করে—'তোমার ভাই খুন হয়ে তার শ্বশুর বাড়িতে পড়ে আছে—আর তুমি কিনা এখানে এখনো ঘুমাচ্ছো?'

'গত রাত থেকে আমি ভয়ানক অসুস্থ। ব্যথায় মাথা তুলতে পারছি না, তাই যেতে পারিনি।' থতমত খেয়ে উত্তর দেয় আবু বকর।

ওর হাবভাব দেখে সবার সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। ওর ঘর তল্লাশি করতে শুরু করলো সবাই। তখন ওর বিছানায় বালিশের তলা থেকে একটা ভেজা টেট্রন শার্ট ও একটি চেক লুঙ্গি পাওয়া গেল। ধোয়ার পরও তাতে স্থানে স্থানে ঈষৎ রক্তের দাগ লেগে ছিল।

আরও খুঁজতেই ওর খাটের তলা থেকে বেরিয়ে পড়লো পানিতে ভেজা কিন্তু স্থানে স্থানে রক্তমাখা একটি চেক গামছা। এসব এভাবে সামলে রাখার কারণ কি তার কোনো সদুত্তর দিতে পারলো না আবু বকর। ওকে আটকানো হলো। সত্যি করে সব ঘটনা খুলে বলতে উপস্থিত সবাই তাকে চাপ দিতে লাগলো।

প্রথমে আবু বকর কিছু বলতে অস্বীকার করলো। কিন্তু অচিরেই সে ভেঙে পড়লো। কাঁপতে কাঁপতে সে স্থানীয় মাতব্বরের হাত ধরে বললো,—'যদি তোমরা কথা দাও যে আমাকে বাঁচাবে তবে আমি সব খুলে বলবো।'

Mamun Academy

'তুমি যদি সব ঘটনা খুলে বলো তবে আমরা অবশ্যই তোমাকে প্রাণে বাঁচাবার চেষ্টা করবো।' কথা দিল উপস্থিত অনেকেই আবু বকরকে।

এবার আবু বকর তাদের কাছে স্বীকার করলো যে তার ভাবী পারুলের যোগ-সাজসে গতরাতে সে তার ভাই-এর ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় গাছি দায়ের কোপে তাকে হত্যা করেছে। আর হত্যার সময় পারুল হারিকেন উঁচু করে ধরে কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, সেই আলোতেই সে এই কাজ সমাধা করেছে।

একজন ছুটি ভোগকারী দারোগাকে হত্যা করা হয়েছে, এই খবর পেয়ে বাঘার পাড়া থানার মেজো দারোগা এস. ঘোষ সকালেই ঐ গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানেই দারোগা বাবু নিহতের বোন মর্জিনা খাতুনের কাছ থেকে ঘটনা সম্পর্কে একটি লিখিত এজাহার নিয়ে তা থানায় পাঠিয়ে দিলেন। তিনি লাশের সুরতহাল রিপোর্ট করে, পোস্ট মর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দিলেন যশোহর হাসপাতালে। তখনই তিনি আসামী আবু বকরকে গ্রেফতার করলেন ও তদন্ত শুরু করলেন। তিনি ঘটনাস্থল থেকে রক্তমাখা মাটি, নিহতের রক্তমাখা বালিশ, চাদর, জামা কাপড় ও আবু বকরের বিছানা ও খাটের নিচ থেকে উদ্ধার করা তার রক্তমাখা ভিজা জামা কাপড় আলামত হিসাবে সীজ করে নিলেন। পরে রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে এগুলোতে মানুষের রক্ত মাখা ছিলো।

পারুলকেও পুলিশ গ্রেফতার করলো। পারুল ঘটনা সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সব খুলে বলতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে, পুলিশ ২০-১-৮১ তারিখে তাকে যশোহরে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করে। সে তখন স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি করে।

Mamun Academy

'আমি মৃত ওমর আলীর স্ত্রী। ১৮-৭ ৭৮ ইং তারিখ মঙ্গলবার রাত দুটো আড়াইটার সময় আমার দেবর আবু বকর দা দিয়ে আমার স্বামীর গলা কেটে দেয়। উল্লিখিত সময়ে আমার দেবর আমার ঘরে প্রবেশ করলে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি ও হারিকেনের আলোতে আবু বকরকে চিনতে পারি। আমি চিৎকার করতে গেলে সে আমাকেও দা দেখিয়ে ভয় দেখায়, বলে যে আমাকেও তাহলে সে খুন করবে। স্বামী ওমর আলী তখনো ঘুমিয়ে। ঘুমন্ত অবস্থায় আবু বকর দা দিয়ে কোপ মেরে তার গলা কেটে দেয়। এই দৃশ্য দেখে আমি বেহুঁশ হয়ে যাই। এর পরের ঘটনা আমি কিছুই জানি না। আবু বকরের সাথে আমার ভাবী-দেবর সম্পর্ক ছিল। পরে হুঁশ ফিরলে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করি, আমার চিৎকার শুনে বাড়ির আশে-পাশের লোকেরা ঘটনাস্থলে আসে এবং বিস্তারিত জানতে পারে।'

স্বীকারোক্তিতে অবশ্য দেখা যায় যে পারুল এই খুনের ব্যাপারে সব দোষ তার প্রেমিক দেবরের উপরই চাপিয়ে দিয়ে নিজে তা থেকে দূরে ছিল বলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে।

যশোহর সদর হাসপাতালের তৎকালীন ডাক্তার এম. হান্নান নিহত ওমর আলীর লাশের পোস্ট মর্টেম (ময়না তদন্ত) করেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পান নিহতের শরীরের বুক থেকে গলা পর্যন্ত দীর্ঘ একটি ক্ষতের চিহ্ন যা ছিল ৮ ইঞ্চি লম্বা ও ৩ ইঞ্চি গভীর। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ওর পাঁজরের দুটি হাড়ও কেটে যায়। বাম পাশের ফুসফুসও ঐ আঘাতে ফুটো হয়ে যায়। ডাক্তারের মতে ৩০ বৎসর বয়স্ক মাঝারি গড়নের ওমর আলীর মৃত্যু ঘটে ঐসব ক্ষতের কারণেই।

পুলিশ মামলার তদন্ত শেষে আসামী আবু বকর ও পারুলের

Mamun Academy

বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগে ৩০২/৩৪ ধারা মতে চার্জশীট দাখিল করে।

এই চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার শুরু হয় ২৩-১০-৮১ তারিখে যশোহরের তৎকালীন প্রথম অতিরিক্ত সেশন জজ জনাব আফজালুল হকের কোর্টে। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট কাজী নুরুজ্জামান। আর আসামী পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট মোশাররফ হোসেন খান।

বিচারের সময় উভয় আসামীই নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করে। আসামী পারুল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার পূর্বোক্ত স্বীকারোক্তির বিবরণ অস্বীকার করে বলে যে পুলিশের চাপেই সে ঐ উক্তি করতে বাধ্য হয়। সেটা তার স্বেচ্ছা প্রণোদিত বিবৃতি নয়। আসামীদের মতে নিহত ওমর আলী পুলিশ অফিসার হিসাবে তার চাকুরী জীবনে অসৎ উপায়ে বহু অর্থ উপার্জন করে। ফলে সে নক্সাল পন্থীদের কোপদৃষ্টিতে পড়ে যায়, তারাই হয়তো দারোগা সাহেবকে এভাবে হত্যা করে পালিয়েছে। আর এই সুযোগে আসামীদের সম্পত্তি ও গহনা হস্তগত করার লোভে আবু বকরের চাচা এয়াকুব আলী ও সাক্ষী মজিনা বিবি উভয়ে যড়যন্ত্র করে এদের দুজনকে মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করেছে।

বিচারের সময় সরকার পক্ষ থেকে মোট ২১জন সাক্ষীকে কোর্টে হাজির করা হয়। ৩ নং সাক্ষী মজিনা বিবি তার জবানবন্দী ও জেরায় প্রকাশ করে যে তার ভাবী আসামী পারুল ভ্রষ্টা চরিত্রের মহিলা ছিল। গ্রামের অনেক লোকের সঙ্গেই তার গোপন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে তার দেবর অবিবাহিত আবু বকরের সঙ্গেই তার অন্তরঙ্গতা বেশি হয়। ওদের দুজনের মধ্যে যৌন সম্পর্কও গড়ে

ওঠে। ঘটনার চারদিন আগে পারুল ও তার প্রেমিক আবু বকর যখন দৈহিক সংসর্গে লিপ্ত ছিলো তখন নিহত ওমর আলী তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে। সেদিন ওমর আলী উভয়কে মারধোরও করে।

বান্দভিলা স্কুলের ছাত্র মসিয়ার রহমানের সাক্ষ্যে জানা যায় যে ১৮-৭-৭৮ তারিখ ৪ টার সময় তার স্কুল ছুটি হলে সে তার মামা বাড়ি কেটরাকান্দি আসে। সেখানে আসামী পারুল তাকে গোপনে ডেকে বলে যে বাড়ি যাবার পথে সে যেন তার দেবর আবু বকরকে খবর দিয়ে বলে তার ভাবী (পারুল) তাকে সেখানে যেতে বলেছে। সেই অনুসারে সে বকরকে তার ভাবীর সঙ্গে দেখা করতে বলে যায়। আর সেই রাত্রেই ওমর আলী খুন হয়।

নিহত ওমর আলীর চাচা ইয়াকুব আলী ও আরও কয়েকজন গ্রামবাসী যারা ঘটনার পর পরই অকুস্থলে পৌছে তাদের সাক্ষ্যে জানা যায় যে তারা সেখানে পৌছে দেখতে পায়, নিহত ওমর আলী ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তবে তখনো তার হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা আছে তার স্ত্রী পারুলের হাতের একগাছি ভাঙা কাঁচের চুড়ির টুকরা। মেঝের রক্তের মধ্যেও পুলিশ কিছু ভাঙা কাঁচের চুড়ি দেখতে পেয়ে তা সাক্ষীদের সামনে সীজ করে নেয়।

মাননীয় বিজ্ঞ জজ তাঁর দীর্ঘ রায়ে বলেন,যদিও এই নৃশংস হত্যা কাণ্ডের কোনো চাক্ষুষ সাক্ষী নেই, কিন্তু তবুও ঘটনা পরম্পরায় এবং খুনের আগে ও পরে এই দুই আসামীর গোপন সম্পর্ক, চালচলন ও ক্রিয়াকাণ্ড পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ওমর আলীর স্ত্রী পারুল ও তার প্রেমিক দেবর আবু বকর উভয়ে যোগ

Mamun Academy

সাজস করেই ওমর আলীকে ঐ রাতে খুন করেছে। আর এই খুনের একমাত্র উদ্দেশ্য এই দুই আসামীর মধ্যে গড়ে ওঠা অবৈধ প্রেমের পথ নিষ্কণ্টক করা। পারুলের আহ্বানেই আসামী আবু বকর ধারালো অস্ত্র হাতে গভীর রাতে ওদের ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই ওমর আলীকে নৃশংস ভাবে খুন করে। আর ঐ সময় স্ত্রী হয়েও পারুল হাতে হারিকেন ধরে পাশে দাঁড়িয়ে তার প্রেমিককে সে-কাজে সহায়তা করছিল। এর চেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা স্ত্রী ও দুই সন্তানের মার পক্ষে আর কি হতে পারে? মৃত্যুপথ যাত্রী ওমর আলী তার অন্তিম সময় বাঁচবার শেষ চেষ্টায় বোধহয় তার স্ত্রীর হাত ধরে ফেলেছিল। পারুল সে হাত দ্রুত জোর করে ছাড়িয়ে নেয়ায় কাঁচের চুড়ি ভেঙে যায় এবং ভাঙা চুড়ির খণ্ড নিজহাতের মুঠোয় রেখেই হতভাগ্য ওমর আলী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। শেষ মুহূর্তে অবশ্য পারুল ও তার মা এই খুনের জন্য শুধু আবু বকরকেই দায়ী করার চেষ্টা করে বিফল হয়। বিজ্ঞ জজ তাঁর রায়ে নিম খুনের অপরাধে উভয় আসামীকেই দোষী সাব্যস্ত করে তাদের দুজনকেই চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। তাঁর মতে উভয় আসামীই এই খুনের জন্য সমভাবে দায়ী। তাই চরম শাস্তিই তাদের একমাত্র প্রাপ্য।

উক্ত রায় অনুমোদনের জন্য মহামান্য হাইকোর্টে পাঠানো হয়। নবগঠিত সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের যশোহর বেঞ্চে ১৯৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে বিচারপতি আবদুল মতিন খান চৌধুরী ও বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানী হয়। এই শুনানীর সময় সরকার পক্ষে ছিলেন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন। আর আসামীদ্বয়ের পক্ষ সমর্থন করেন ব্যারিস্টার এম. এ. আজিজ। মান-

Mamun Academy

তার জন্য দশ হাজার ভারতীয় রুপী পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু তবুও এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কেউ পায়নি তার নাগাল।

উত্তর ভারতের উজালান জেলার 'পুরা' গ্রামে এক দরিদ্র নিম্নবর্ণের হিন্দু 'মাল্লা' পরিবারে ১৯৫৬ সালে ফুলনের জন্ম হয়। যমুনা নদীর পাড়ে অবস্থিত ঐ গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল গরীব নমশূদ্র। যমুনা নদীতে নৌকা বেয়েই তাদের অধিকাংশ মেয়ে-পুরুষ জীবিকা নির্বাহ করতো। ফুলনও ছোটকাল থেকে তার বোনদের সাথে যমুনা নদীতে যাত্রী পারাপার করতো। যৌবনের প্রারম্ভে তাকে প্রথমে বিবাহ দেয়া হয় ৪৫ বৎসর বয়স্ক এক বিপত্নীক প্রৌঢ়ের সঙ্গে। স্বামী ও তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় সেখানে নিগৃহীত হয়ে তাকে নিজ গ্রামে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু এখানেও এবার তার আর শান্তি মেলে না। এই সময় কৈলাস নামক আর এক ব্যক্তির সঙ্গে তার দ্বিতীয় বিবাহ হয় বলে জানা যায়। কিন্তু কিছুদিন পর কৈলাসও ফুলনকে ত্যাগ করে চলে যায়। এরপর বাপমার বাড়িতে ফিরে এসে সেখানেও সবার ধিক্কার ও ভৎর্সনার পাত্রী হয়ে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এ সময় ফুলনের বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। তখন কৈলাসের এক বন্ধু ডাকাত বিক্রম সিংহ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ২৭ বৎসরের বিক্রম ছিল দুর্ধর্ষ ডাকাত সর্দার গুজারের দলের অন্যতম সদস্য। ঐ দলের নেতা হওয়ার মানসে একদিন কৈলাস সর্দার গুজারকে হত্যা করে।

বিক্রমকে কিন্তু ফুলন সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। অতীতের ব্যর্থ প্রেমের কথা ভুলে গিয়ে সে তার ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছিল একে ঘিরেই। কিন্তু এমন সময় ১৯৮০ সালের আগস্ট মাসে ফুলনের অগোচরে বিক্রমকে গুলি করে নিষ্ঠুরভাবে

Mamun Academy

হত্যা করা হয়। ফুলন ভয়ানক আঘাত পায় এই হত্যাকাণ্ডে। তার দৃঢ় বিশ্বাস বিক্রমের শত্রু বেহামী গ্রামের ঠাকুর বংশের দুই জমজ ভাই ডাকাত লালারাম সিং ও শ্রীরাম সিং-ই তার প্রেমিককে হত্যা করেছে। আবার এদের দুজনের হাতেই ফুলন এর পরপরই ধর্ষিতা হয়। ঐ হত্যাকাণ্ড ও তার ওপর পাশবিক অত্যাচারের নালিশ নিয়ে ফুলন থানায় গিয়ে বিচার চায়। কিন্তু সেখানেও তার কপালে জোটে শুধু টিটকারি। এতে সভ্য সমাজের প্রতি সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। এ ছাড়া ফুলন ছোটকাল থেকেই দেখেছে তার নিজগ্রামের উচ্চবর্ণের ঠাকুরেরা নিম্নবর্ণের মাল্লাদের ওপর কি অকথ্য অত্যাচার করতো। সেই থেকেই উচ্চবর্ণের লোকদের ওপর ফুলনের ছিল এক বিজাতীয় বিদ্বেষ। এবার সে প্রতিজ্ঞা করলো সে নিজেই নেবে এই সব অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিশোধ।

প্রেমিক বিক্রমের অবর্তমানে যুবতী ফুলন অনেকটা অসহায় হয়ে পড়ে। চারদিকের ডাকাত দলের মধ্যে সে নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। সভ্য সমাজে ফিরে যাবার পথও তখন তার রুদ্ধ। এই সময় সে বড় ডাকাত সর্দার বুড়ো মুস্তাকিমের শরণাপন্ন হয়। তাকে 'বাবা' সম্বোধন করে নিজেকে তার দলে গ্রহণ করার জন্য ফুলন মুস্তাকিমকে একান্ত অনুরোধ করে। প্রথমে বাবা মুস্তাকিম ফুলনকে তার দলে নিতে অস্বীকার করে। কিন্তু পরে ওর অসহায় অবস্থা দেখে নিয়ে নেয়। সেই থেকে বাবা মুস্তাকিমকে ফুলন দেবী পিতার মতো শ্রদ্ধা করে আসছিল। মুস্তাকিমও তাকে মেয়ের মতো স্নেহ করতো।

ডাকাত দলের মধ্যে বাবা মুস্তাকিম কিন্তু ছিল এক ব্যতিক্রম ধর্মী সর্দার ও ব্যক্তিত্ব। গুলাউলী গ্রামের বাসিন্দা মুস্তাকিম ছিল ধর্মপ্রাণ এক মুসলমান। ঐ গ্রামের ১১ হাজার অধিবাসীর মধ্যে শত-

করা ৯০ জন ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী। ডাকাত হলেও মুস্তাকিম ছিল অনেক মানসিক গুণের অধিকারী। গ্রামবাসী ও ডাকাত দলের কাছে সে ছিল পিতৃতুল্য; তাই তাকে সম্মানের সাথে সবাই 'বাবা মুস্তাকিম' বলেই সম্বোধন করতো। নরহত্যা ও নারী নির্যাতনের সে ভয়ানক বিরোধী ছিল। দরিদ্র গ্রামবাসী ও আত্মীয়স্বজনদের সে মুক্ত হস্তে টাকা পয়সা দান করতো। তাই সবার কাছে সে আধুনিক 'রবিনহুড' নামে পরিচিত ছিল। সে কারণেই ওর নিজ গ্রাম গুনাউলীতে কেউ চুরি ডাকাতি করতে সাহস করতো না। মোট কথা গ্রামবাসী ও ডাকাত দলের কাছে সে ছিল পরম শ্রদ্ধার পাত্র। মুস্তাকিম ফুলনকেও ভৎর্সনা করতো তার বিভিন্ন পুরুষের সংসর্গে যাবার কারণে।

বাবা মুস্তাকিমের দলের ডাকাত মানসিং যাদবের সঙ্গে অচিরেই ফুলনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠলো। তাকে প্রেমের বাঁধনে বেঁধে নিয়ে ফুলন তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে নিয়ে একটি ছোট্ট ডাকাত দল গঠন করলো। তারা 'রাম অবতার' রঘুনাথ মাল্লা ও বলবান গারদিয়ার-এর তিন ডাকাত দলের সঙ্গে এক সমঝোতায় পৌছে ঠিক করলো যে তারা সবাই নিজ নিজ দলে থেকেই সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাবে। আবার এই চার দলই প্রধান নেতা বাবা মুস্তাকিমের অধীনে থাকবে। কোনো অপারেশনে বেরুবার সময় তারা সবাই 'বাবা মুস্তাকিম কি জয়' বলে স্লোগান দিয়ে কাজে নামতো। এই দলে মোট ৪০ জন পুরুষ ও মেয়ে ডাকাত ছিল। আর এদের সাধারণ শত্রু ছিল ঠাকুর সম্প্রদায় ও তাদের নেতা ডাকাত লালারাম ও শ্রীরাম। বলাবাহুল্য এদের দুজনের প্রতিই ফুলন দেবীর ছিল প্রচণ্ড আক্রোশ।

আগেই বলেছি বাবা মুস্তাকিম কিন্তু ডাকাত সর্দার হয়েও নিজস্ব

একটি নীতিমালা অনুসরণ করে চলতো ও অযথা হত্যাকাণ্ডের বিরোধী ছিল। তার দলের ডাকাত বলবানের বোনকে একবার এক পুলিশ অফিসার আটক করে তাকে ধর্ষণ করে। এই অপমানের প্রতিশোধ যখন বলবান সমগ্র পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে নিতে চাইলো এবং দলনেতা মুস্তাকিমের শরণাপন্ন হলো, তখন সে কিন্তু কেবলমাত্র দোষী ঐ পুলিশ অফিসারকেই হত্যা করার অনুমতি দিল—অন্য কাউকে নয়। দলপতির এই মনোভাবের কথা জেনেও ফুলন কিন্তু ঠাকুর লালারাম ও শ্রীরামের বিরুদ্ধে তার প্রতিশোধের কথা ভোলে নাই।

১৯৮১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তার দলবল নিয়ে ফুলন দেবী হঠাৎ রাত্রে ঘেরাও করলো উক্ত দুই ভাই-এর গ্রাম 'বেহামী'। ফুলন নিজেই নেতৃত্ব হিসাবে পুলিশ অফিসারের পোশাকে সজ্জিত হয়ে এই অভিযান পরিচালনা করে। তার আদেশে গ্রামবাসীদের সবাইকে হাজির করা হলো তার সামনে। গ্রাম প্রধানের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে ফুলন তাদের আদেশ করলো লালারাম ও শ্রীরামকে তার হাতে তুলে দিতে, অথবা তাদের সন্ধান দিতে। কিন্তু গ্রামবাসীরা নিরুত্তর। এ দেখে রাগে ফেটে পড়লো ফুলন দেবী। চল্লিশজন গ্রামবাসীকে লাইনে দাঁড় করিয়ে সে 'জয় মা কালী' বলে হাঁক ছেড়ে তার দলকে আদেশ দিলো ওদের সবাইকে তখনই খতম করতে। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই গুলি চালিয়ে কয়েকজনকে ধরাশায়ী করলো। দেখতে দেখতে বেহামী গ্রামে বয়ে গেল রক্তের বন্যা। সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে ত্রিশ জনকে গুলিবিদ্ধ করা হলো, সেখানেই কুড়িজন মারা গেল। অন্যেরা রক্তাক্ত কলেবরে মাটিতে গড়াগড়ি যেতে থাকলো। মেয়েরা কান্নায় ভেঙে পড়লো। এরপর ফুলনের অনুমতি নিয়েই তার দলের পুরুষ ডাকাতেরা চালালো লুণ্ঠন ও গ্রামের

MamunAcademy

মহিলাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার। যাদের জন্য এত অঘটন তারা দুজন অর্থাৎ লালারাম ও শ্রীরাম কিন্তু তখন পার্শ্ববর্তী গ্রাম দাস্তামপুরে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ছিল।

চম্বল ও এই অঞ্চলের ডাকাতদল কর্তৃক একসঙ্গে এতবড় এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড এর আগে আর হয়নি। এক নারী ডাকাত দ্বারা এই রোমহর্ষক পাইকারী হত্যার কথা সংবাদপত্র মারফত জানতে পেরে সমগ্র ভারতবাসী হতবাক হয়ে গেল। উত্তর প্রদেশের তৎকালীন ঠাকুর মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং হত্যাকারীদের সমুচিত শিক্ষা দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। সেই সঙ্গে পার্শ্ববর্তী মধ্য প্রদেশের তৎকালীন ঠাকুর মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিং-এর সঙ্গে একযোগে ডাকাতদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার সংকল্পও ঘোষণা করলেন। এদের দমন না করতে পারলে তিনি পদত্যাগেরও হুমকি দিলেন।

বেহমই হত্যাকাণ্ডের পরদিন অর্থাৎ ১৫ ফেব্রুয়ারী রাতে ফুলন দেবী অল্পের জন্য পুলিশের হাত থেকে রেহাই পায়। ঐ রাতে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর দুর্লভ লাল যাদব কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ফুলনদের খোঁজে তার গ্রামের কাছে 'মুকদালানে' কয়েকটি খাদের নিকট টহল দিচ্ছিল। সে-রাতে ফুলনও এর কাছাকাছিই ছিল। গভীর রাতে ফুলন ভাবলো এরা পুলিশের ছদ্মবেশে তার জাত শত্রু লালারাম ও শ্রীরামের ডাকাতদল। পুলিশের লোকেরা টহলের সময় ওখানকার নরম মাটিতে পায়ের স্পষ্ট ছাপ দেখে অগ্রসর হচ্ছিল। ঐ চিহ্ন ধরে ফুলনের দলও খাদের আড়ালে আড়ালে এগুচ্ছিল। রাত প্রায় দুটোর সময় দুদল খুব কাছাকাছি এসে গেলে রাতের নির্জনতা ভেঙে উচ্চ কণ্ঠে 'কৌন হ্যায়' বলে এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো পুলিশ দল মাত্র ২৫ গজ দূর থেকে। ঐ গলা শুনে পুলিশ অফি-

Mamun Academy

সার দুর্লভ লাল ঠিক বুঝতে পারলো ওটা ফুলন দেবীর দলের ডাকাত রাম-অবতারের গলা। ঐ ডাকাত যখন জেলে ছিল তখন থেকেই দুর্লভ তাকে চিনতো।

ওদের সাড়া পেয়েই পুলিশ দল মাটিতে শুয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে সন্তর্পণে এগুতে লাগলো। এমন সময় ওরা শব্দ পেলো যে ডাকাতেরা তাদের বন্দুকে গুলি লোড করছে। একজন পুলিশ তাতে ভীত হয়ে তার হাতের এল. এম. জি. থেকে শূন্যে একঝাঁক গুলি ছুঁড়লো। এতে ফুলন দেবীর দল টের পেয়ে গেল যে এরা পুলিশের লোক। সঙ্গে সঙ্গে তারা গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করলো। এ ভাবেই ফুলনকে ধরার এক মোক্ষম সুযোগ সেদিন হারালো পুলিশ।

এরপর দুই প্রদেশের বিশাল পুলিশ বাহিনী সমগ্র এলাকায় ডাকাতদল নির্মূল করতে নিয়োজিত হলো। এজন্য একজন পুলিশ ডি. আই. জিকে এই এলাকার বিশেষভাবে নিয়োগ করা হলো। এই পুলিশদের দেয়া হলো আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র, গ্রেনেড, বেতার যন্ত্র, এমন কি হেলিকপ্টার পর্যন্ত।

সমগ্র ডাকাতদলের সর্দার বাবা মুস্তাকিম কিন্তু বেহমীর হত্যা-কাণ্ডের কথা শুনে 'থ' বনে গেল। নিরপরাধ গ্রামবাসীদের এভাবে হত্যা করাতে সে ভয়ানক ক্ষুব্ধ হলো। অন্যান্য ডাকাত দলও এতে ফুলন দেবীর উপর রেগে গেল। কারণ তারই জন্য আজ এদের সবাইকে মারাত্মক পুলিশ অভিযানের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এর পর পুলিশের সাথে কয়েকটি সংঘর্ষে অনেক ডাকাত মারা পড়লো।

এই সময় ঘটে গেলে আর এক ঘটনা।

৪ঠা মার্চ (১৯৮১) সকাল ৮ টায় কানপুর জেলার গৌলাপুরে একটি বাস থেকে নামলো দুজন যাত্রী। এদের একজনের হাতে ছিল

একটা ব্যাগ। তারা মাটির রাস্তা ধরে হেঁটে দাস্তামপুর গ্রামের দিকে রওনা হলো। এমন সময় বিপরীত দিক থেকে সাইকেলে চড়ে পোশাকধারী হরিরাম দারোগা ও এক কনস্টেবল ওদের দিকেই আসছিল। বয়স্ক যাত্রিটি কিন্তু পুলিশের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই এগুচ্ছিল, কিন্তু অন্যজন যার হাতে ব্যাগটি ছিল, সে পুলিশ দেখে ভয়ে পথ ছেড়ে অন্যদিকে দৌড়াতে শুরু করলো। তার হাবভাব দেখে পুলিশের সন্দেহ হলো। পুলিশ ওদের দুজনকেই ধরে ফেলে ওদের ব্যাগ হাতড়াতে শুরু করলো। তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়লো একটি রিভলভার। এ দেখে বয়স্ক লোকটি পুলিশের হাত থেকে রিভলভারটি কেড়ে নেবার চেষ্টা করলো। বেধে গেল উভয় দলের মধ্যে তুমুল ধস্তাধস্তি। সে-সময় ছিটকে রিভলভারটি নিচে পড়ে গিয়ে ওর ট্রিগার ভেঙে গেল। পুলিশেরা ওদের দুজনকেই চেপে ধরে সাহায্যের জন্য গ্রামবাসীদের ডাকলো। কিন্তু কোনো গ্রামবাসী কাছে এলো না। সৌভাগ্যক্রমে তখন একদল কলেজের ছাত্র ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশের সাহায্যে তারা এগিয়ে এলো। ওদের সাহায্যে পুলিশ দুজনকেই পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে ফেলে মারতে মারতে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো তাদের নাম ও পরিচয়, রিভলভারই বা তারা কোথায় পেল। শেষে পরাজিত বয়স্ক লোকটি রক্তাক্ত কলেবরে দারোগার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললো—'জানতে চাও আমি কে? আমি "বাবা মুস্তাকিম"।' এই উত্তর শুনে সবাই 'থ' বনে গেল। ওদের কেউ চিন্তাও করতে পারেনি যে বাবা মুস্তাকিমের মতো বাঘা ডাকাত সর্দার এখানে ধরা পড়তে পারে, তাও আবার এভাবে। দারোগা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না যে এই সেই মুস্তাকিম যে ডাকাত সর্দারের মাথার জন্য ২০,০০০ রূপী পুরস্কার ঘোষণা

Mamun Academy

করা আছে।

যার হাতে ব্যাগটি ছিল সে মুস্তাকিমের চাচাত ভাই ইমামুদ্দীন। সে কিন্তু কোনো ডাকাত দলে ছিল না। তাকে শুধু মুস্তাকিম সঙ্গে নিয়েছিল ওকে বোম্বাই পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য।

হরিরাম দারোগা ওদের দুজনকে আরও ভালোভাবে আঁটসাট করে বেঁধে ফেললো, এবং গ্রামের একজনকে দিয়ে নিকটবর্তী দারাপুর থানায় আরও পুলিশ চেয়ে খবর পাঠালো।

বাবা মুস্তাকিম তখন আহত ও খুবই পরিশ্রান্ত। ৩রা মার্চ রাতে সে কানপুর ত্যাগ করেছে। বেহামী হত্যাকাণ্ডের পর সে খুবই বিচলিত হয়েছে, তার ওপর পুলিশের তাড়নায় সেই হতে তারা সবাই অস্থির ছিল। তাই জঙ্গলের গোপন আড্ডা থেকে বেরিয়ে এসে এ যাত্রায় তার উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে নিজ গ্রামে গিয়ে তার ভাই-এর হাতে গরীবদের জন্য কিছু টাকা দিয়েই সোজা চলে যাবে বোম্বাই। সেখানে ভিড়ের মধ্যে বেশ কিছুদিন বিশ্রাম ভোগ করবে সে। পথে আকবরপুর থেকে সে তার চাচাত ভাই ইমামুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়েছিল ওকে বোম্বাই পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য। তারপরেই এই বিপত্তি।

শিগরিয়ট থানা থেকে একটি টেম্পো নিয়ে চারজন কনস্টেবল সেখানে পৌঁছে গেল। মুস্তাকিম এবার বুঝতে পারলো তার ভাগ্যে কি আছে। সে দারোগাকে অনুরোধ করলো, 'তুমি আমাকে মেরে ফেল, কিন্তু ইমামুদ্দীনকে ছেড়ে দাও, সে তো কোনো দোষ করেনি।'

'তোমাদের কাউকেই মারা হবে না। শুধু থানায় নিয়ে যাবো।' অভয় দিল ওকে হরিরাম দারোগা।

'আমার সঙ্গে বেশ কিছু টাকা আছে। যাবার আগে আমি তা

গরীবদের মধ্যে এখনই বিলিয়ে দিতে চাই।' এই বলে মুস্তাকিম তার জামার ভেতর থেকে ১০৭ টাকার নোটের ১০ টা বাণ্ডিল অর্থাৎ ১ লাখ রুপী বের করে দেখালো, দারোগা সঙ্গে সঙ্গে ঐ নোটের বাণ্ডিল-গুলি আর সেই সঙ্গে মুস্তাকিমের হাতঘড়ি ও আঙ্গুল থেকে চারটি আংটি খুলে নিজ হেফাজতে নিয়ে নিল।

বোধ হয় পরিণতি আঁচ করতে পেরে শ্রদ্ধাভরে মুস্তাকিম তার বাহুর মাছলিটি ধরে একবার চুমু দিল। আবার সে অনুরোধ করলো শুধু ইমামুদ্দীনকে ছেড়ে দিতে। ওর অনুরোধে কান না দিয়ে দারোগার আদেশে ওদের দুজনকেই বাঁধা অবস্থায় ঠেলে টেম্পোর ভেতরে উঠানো হলো। পুলিশরাও উঠে বসলো। টেম্পোটি কিছুদূর এগিয়ে একটি পুলের কাছে নির্জন জায়গায় থেমে পড়লো। এবার মুস্তাকিমকে টেনে বের করা হলো টেম্পো থেকে। তারপর একসঙ্গে বন্দুক ও রাইফেলের গুলি চালিয়ে প্রথমে মুস্তাকিম ও পরে ইমামুদ্দীনকে হত্যা করা হলো। গুলিতে ঝাঁঝরা করা ওদের লাশ নিয়ে টেম্পো থানার দিকে রওনা হলো।

পুলিশ অবশ্য বলে যে পথে আসামী দু'জন পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে তারা তাদের গুলি করে হত্যা করে।

পিতৃতুল্য বাবা মুস্তাকিমের এই করুণ মৃত্যু সংবাদে ফুলন খুব বিচলিত হলো। তার মনে হলো ওর কারণেই বাবা মুস্তাকিমের এই চরম পরিণতি হলো। অন্যান্য ডাকাতেরাও পেলো চরম আঘাত। তার বিহনে ডাকাতেরা যেন অভিভাবকহীন হয়ে পড়লো।

মুসলমান কেউ মারা গেলে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী চল্লিশ দিন যাবত চেহলাম পালন করা হয়। ডাকাতদের মধ্যে নিয়ম আছে: ঐ সময়ের মধ্যে দলের কেউ কেউ নিহতের গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয়ে

শোকপ্রকাশে শরিক হয়।

গুলাউলী গ্রামে মুস্তাকিমের ভাই-এর বাড়িতে তখন চলছিল চল্লিশ দিন ব্যাপী শোক প্রকাশ। বিরাট বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ফুলন দেবী ঠিক করলো মানসিং ও তার দলের পাঁচ জন সহকর্মীকে নিয়ে সে ঐ সময়ের মধ্যে গুলাউলী গ্রামে উপস্থিত হয়ে শোকপ্রকাশে শরিক হবে। পুলিশও কিন্তু ডাকাতদের এই রীতির কথা জানতো. তাই তারা ঐ গ্রামের আশেপাশে অনেক চর লাগিয়েছিল ডাকাতদের খবর সংগ্রহের জন্য।

বাবা মুস্তাকিমের হত্যার ২৭ দিনের মাথায় ৩১শে মার্চ সকালে কালাপি থানায় খবর পৌঁছলো যে ফুলন দেবী তার দলবল নিয়ে গুলাউলী গ্রামে পৌঁছে গেছে। তখনই দারোগা দুর্লভ লাল যাদবের নেতৃত্বে পনের জন পুলিশের একটি দল এল.এম. জি. রাইফেল, গ্রেনেড ইত্যাদি নিয়ে ঐ গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। দুপুর নাগাদ তারা ঐ গ্রামে পৌঁছে গেল। ফুলনের দলের এক ডাকাতের আত্মীয় মাতাদিনের বাড়িতে ওরা আছে এই খবর পেয়ে পুলিশ ঐ বাড়ি ঘেরাও করলো। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে ওরা কেবল পেল সেবারণ সিং নামক এক ডাকাতকে। তার হাতে ছিল একটি ৩১৫ রাইফেল। আর পেল লালতু নামক এক ধোপাকে, ওর হাতে ছিল লাইসেন্স বিহীন একটি ভারতীয় বন্দুক। পুলিশ আশ্চর্য হলো লালতু ধোপাকে ওখানে ডাকাত দলে দেখে। ঐ লালতুই ছিল থানার পুলিশদের বিশ্বস্ত ধোপা।

কিন্তু কোথায় লুকিয়ে আছে ফুলন দেবী ?

ওদের মেসেজ পেয়ে একজন এস. পি-র নেতৃত্বে আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত এক বিশাল পুলিশ বাহিনী ঐ গ্রামে বিকেল ৪টার মধ্যে পৌঁছে

Mamun Academy

গেল। এবার শুরু হলো সমস্ত গুলাউলী গ্রাম ঘেরাও করে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি। এ গ্রামের অধিকাংশই মুসলমান। কেবল অল্প কয়েক ঘর নমশূদ্রেরও বসবাস ছিল সেখানে। তবে গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সবাই বাবা মুস্তাকিমকে পীরের মতো ভক্তি করতো। ফুলন দেবী বা তার দলবলের অবস্থান সম্পর্কে গ্রামের কেউই কিন্তু পুলিশের কাছে মুখ খুললো না।

পুলিশের আদেশে গ্রামের সব বাড়ি থেকে মেয়ে-পুরুষ সবাইকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হলো। সব গ্রামবাসীকে লাইনে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা করা হলো। গ্রামের প্রত্যেকটি মহিলাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হলো ফুলন দেবী ছদ্মবেশে ওদের মধ্যে আছে কিনা। পুলিশের কাছে ফুলনের কোনো ফটো ছিল না। তবে তার চেহারার একটি বিশদ বিবরণ ওদের দেয়া ছিল। ফুলন যাতে ছদ্মবেশে গ্রামের বাইরে যেতে না পারে সে-ব্যাপারেও পুলিশ খুব সতর্ক ছিল।

পুলিশ খুঁজতে খুঁজতে নিয়ামত বোবার বাড়িটা ঘেরাও করলো। ঐ বাড়িতেই লুকিয়ে ছিল ফুলন দেবীর দলের তিনজন সহচর—প্রহ্লাদ যাদব, বালাদীন ও প্রেম সিং। ওরা তিনজন একটি কামরায় ঢুকে তার দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগাবার ব্যবস্থা করেছিল যাতে মনে হয় ভেতরে কেউ নেই। কিন্তু পুলিশ ওদের চালাকি টের পেয়ে বন্ধ দরজায় গুলি করে তা খুলে ফেললো, কিন্তু তবুও কোনো ডাকাত বাইরে বেরিয়ে এলো না। তখন এস.পি. মিঃ বাজপাই এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেন। ডাকাতদের সামনে এগুনো বিপজ্জনক, তাই তিনি পিছন দিক থেকে ঘরের মাটির দেয়াল বেয়ে উঠে খড়ের চাল ফাঁক করে ডাকাতদের অতর্কিতে আক্রমণ করলেন। ডাকাতরা ভেতর থেকে গুলি চালালো। ঐ গোলাগুলিতে দুজন ডাকাত—

Mamun Academy

প্রহ্লাদ ও প্রেম সিং ওখানেই প্রাণ হারালো। এ পক্ষে তিনজন দারোগা ও একজন সিপাহী আহত হলো। পুলিশ ঐ ঘর থেকে দুটো রাইফেল উদ্ধার করলো। অন্য ডাকাত বালাদীন কিন্তু অক্ষত ছিল। সে দুহাত ওপরে তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশের কাছে ধরা দিল। কিন্তু ফুলন কোথায়? ওকে না মেরে ফুলন সম্পর্কে আরও খবর সংগ্রহের আশায় আটকে মিঃ বাজপাই প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের নেতা ফুলন দেবী কোথায় আছে?'

'আজ সকাল ১১টা পর্যন্ত সে এখানেই ছিল, কিন্তু এখন কোথায় আছে বলতে পারি না,' উত্তর দেয় বালাদীন।

এখন ফুলনকে কিভাবে পাকড়াও করা যায় সে-সম্বন্ধে পুলিশেরা যখন নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত, তখন ওদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে বালাদীন হঠাৎ এক লাফ মেরে উঠন পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। পুলিশেরা ধর ধর বলার আগেই সে বেশ দূরে ওদের চোখের আড়ালে চলে এসেছে। তাড়াহুড়া করে একজন সিপাই তার এল. এম. জি থেকে একঝাঁক গুলি ছুঁড়লো ওর গমন পথে, কিন্তু ততক্ষণে বালাদীন ওদের নাগালের অনেক বাইরে চলে গেছে। অনেক খুঁজেও আর তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

এবার পুলিশ ফুলন দেবী ও তার প্রেমিক মানসিংকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টায় ব্রতী হলো। ওরা দুজনে যে ঐ গ্রামে লুকিয়ে আছে সে-ব্যাপারে পুলিশ নিঃসন্দেহ ছিল। কিন্তু কোথায় আছে তারা? কোনমতেই তাদের খুঁজে বের করতে পারলো না। গ্রামের অনেকেই জানতো তারা কোথায় লুকিয়ে আছে। কিন্তু পুলিশের কাছে তারা কেউ কিছু বললো না।

Mamun Academy

পরবর্তীকালে সাংবাদিক নির্মল মিত্র ঐ গ্রামে গিয়ে জানতে পারেন যে ফুলন ও মানসিং পুলিশী তল্লাশির সময় ঐ গ্রামেরই কারার হোসেনের একটি ভাঙা পরিত্যক্ত বাড়িতে লুকিয়ে ছিল। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য ঐ সময়ের মধ্যে ফুলন তিনবার তার পোশাক বদল করে নেয়। একবার সে পরে সেলওয়ার-কামিজ, অন্য দুবার বিভিন্ন শাড়ি। পুলিশ গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে পরদিন সকাল ১০ টার দিকে যখন সে লুকানো জায়গা থেকে মানসিংকে নিয়ে সহাস্যে বেরিয়ে এলো তখন তার পরিধানে ছিল পুলিশ অফিসারের পোশাক ও হাতে রাইফেল।

গ্রামের চারপাশের কড়া পুলিশ বেষ্টনী ভেঙে কিভাবে বালাদীন পালালো সে খবরও সাংবাদিকেরা উদ্ধার করে। বালাদীন পুলিশের হাত থেকে বেরিয়ে এসে সে-গ্রামেরই একটি শূকর রাখবার ঘরে ঢুকে ঐ শূকরগুলির মধ্যেই পালিয়ে ছিল সারারাত, পুলিশ গ্রাম ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত। সেদিন পুলিশ সারারাত সব গ্রামবাসীদের ঘরের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখে। একে একে তারা প্রতিটি ঘর তল্লাশি চালায় সারারাত ও পরদিন সকাল ৯টা তক। শেষ পর্যন্ত প্রায় বিফল হয়ে ১লা এপ্রিল সকাল ৯টায় তারা গ্রাম ত্যাগ করে।

এদিকে লাক্ষ্ণৌতে খবর রটে গেল যে ফুলন দেবীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাকে নিয়ে একটি হেলিকপ্টার ঐ দিনই লাক্ষ্ণৌ পৌছাচ্ছে। এই গুজব সারা শহরে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো। দেখতে দেখতে হাজার হাজার লোক, সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার ভিড় করলো লাক্ষ্ণৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ডাকাত রাণীকে এক নজর দেখবার আশায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এটা ছিল সেদিনের ১লা এপ্রিলের এক সফল এপ্রিল ফুল।

Mamun Academy

আরও জানা যায় যে ফুলন দেবীর খাদ ও জঙ্গল ঘেরা নিরাপদ আস্তানা থেকে গুলাউলী গ্রামে আসতে হলে বিশাল যমুনা নদী পার হতে হয়। পুলিশ ঐ নদী পারাপারের ঘাটে সাদা পোশাকে সব-সময় সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল যেন সে-সময়ে তাকে ধরা যায়। কিন্তু ধূর্ত ফুলন দেবী ও পথে না গিয়ে যমুনা নদীর ওপরের বিরাট রেল-ওয়ে ব্রিজের ওপর দিয়ে (যাতে শুধুমাত্র কাঠের স্লীপার বসানো ছিল, লোকের হেঁটে পার হওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না) রাত্রি-কালে দুঃসাহসিকভাবে সবার অগোচরে হেঁটে পার হয়ে ঐ গ্রামে এসে পৌঁছে।

১৪ই ফেব্রুয়ারীর হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশের সঙ্গে ডাকাতদলের কয়েকটি সংঘর্ষ হয়ে যায় যাতে উভয় পক্ষকেই মারাত্মক ক্ষতির সম্মু-খীন হতে হয়। ঐ সময় ফুলন দেবীর দল সহ ঐ অঞ্চলে মোট ৯টি ডাকাতদল সক্রিয় ছিল। তার একটির নেতা ছিল ব্রাহ্মণ সন্তোষ পণ্ডিত। সে ছিল বি. এ. বি. এড. পাশ। তবে বাবা মোস্তাকিমই ছিল এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সম্মানী নেতা।

একটি ডাকাত দলের প্রধান ছিল'বালওয়ান'। ২৪শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ খবর পেল যে বালওয়ানের ডাকাতদল 'বেহাতা' গ্রামে লুকিয়ে আছে। এর মাথার দাম ঘোষণা করা হয় ২০০০ রুপী। ঐ দলে মীরা ঠাকুর নামে এক মহিলা ডাকাতও ছিল। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত চলে এলো ঐ গ্রামে। উভয় পক্ষের মধ্যে চললো প্রচণ্ড গোলা-গুলি। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ডাকাত দলকে ধাওয়া করে ৩৫ কিলো-মিটার দূরে বেতওয়া নদী পর্যন্ত নিয়ে গেল। এই নদীই হরিরামপুরে এসে যমুনা নদীর সঙ্গে মিশেছে। এখানে পৌঁছে ডাকাত দলের কয়েকজন ছদ্মবেশে নিকটবর্তী এক ইটের ভাটার মজুরদের সঙ্গে

Mamun Academy

Mamun Academy

কিন্তু আগের মতো এবারও ফুলন দেবী তার প্রতিশ্রুতির হেরফের হতে দেয়নি। যথা সময়ে সে আর এক মহিলা ডাকাত মুন্নি বাই ও দুর্ধর্ষ ডাকাত ঘনশ্যাম সহ মোট ২৪ জন কুখ্যাত ডাকাতকে সঙ্গে নিয়ে স্বেচ্ছায় ঐ অনুষ্ঠান সভায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করে মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিং-এর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সেই সঙ্গে তাদের এত-দিনের প্রিয় অস্ত্রগুলিও তুলে দেয় সরকারের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর উপ-স্থিতিতে।

এদের প্রায় সবাইকেই জীবিত বা মৃত ধরে দেবার জন্য সরকার বিভিন্ন অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। ফুলন দেবীর প্রেমিক ডাকাত মানসিং এ সময় সর্বক্ষণ তার পাশে পাশে ছিল।

ঐ অনুষ্ঠানে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেবার সময় মুখ্য-মন্ত্রী বলেন, এই আত্মসমর্পণ শর্তহীন, ও ক্রমাগত পুলিশী তৎপরতায় সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ঐ ঘোষণার বিরোধিতা করে ফুলন দেবী তার পকেট হতে এক খণ্ড কাগজ বের করে জানায় যে তাদের এই আত্ম-সমর্পণ অবশ্যই শর্তযুক্ত। সে ঐ কাগজ পাঠ করে নিম্নলিখিত শর্ত-গুলি জনতা ও সাংবাদিকদের সামনে পড়ে যায়—(১) তাকে উত্তর প্রদেশের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা চলবে না। (২) উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থানে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সবগুলি মাম-লার বিচার বিশেষ আদালতে একই স্থানে হতে হবে। (৩) তাকে পুলিশ রিমাণ্ডে রাখা চলবে না। (৪) তাকে একটি উন্মুক্ত কারাগারে রাখতে হবে ও ইতিপূর্বে আত্মসমর্পণকারী ডাকাতদের প্রদত্ত সকল সুবিধা প্রদান করতে হবে। (৫) তার পরিবারের সকল সদস্য এবং আত্মীয়স্বজনদের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান ও পুনর্বাসন করতে হবে। (৬) তার পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য

আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দিতে হবে।

সেই সঙ্গে ফুলন দেবী তার বিবৃতিতে অমানবিক আচরণের জন্য উত্তর প্রদেশের পুলিশকে অভিযুক্ত করে বলে, সেই কারণেই সে মধ্যপ্রদেশ কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণকে শ্রেয় মনে করেছে।

আত্মসমর্পণের ৮ দিনের মধ্যেই বিন্দের একটি বিশেষ আদালতে ফুলন দেবীর বিরুদ্ধে প্রথম মামলার বিচার শেষ হয়। আদালতে তার বিরুদ্ধে পুলিশের পোশাক পরিধান, অবৈধ অস্ত্র রাখা ও ব্যবহার সহ আরও কয়েকটি অভিযোগ আনয়ন করলে ফুলন দেবী সে সব অপরাধ স্বীকার করে নেয়। অতঃপর আদালত ঐ মামলায় তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে তাকে গোয়ালিয়রের একটি কারাগারে প্রেরণ করে।

অন্যান্য অপরাধের জন্য তাকে অবশ্য আরও কয়েকবার বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

—: সমাপ্ত :—

Mamun Academy

কাঠগড়ার মানুষ

(প্রথম খণ্ড)

কয়েকটি চাঞ্চল্যকর মামলার সত্য বিবরণ

মোঃ মুমিনুর রহমান

Mamun Academy

অনেক মুখরোচক বিষয় রয়েছে এতে।
দশ-দশটি বছর সুখী বিবাহিত জীবন অতিবাহিত
করবার পর স্বামী নওয়াজ ও তিন বাচ্চাকে ফেলে
পর-পুরুষের সাথে পালিয়ে গেল লাহোরের ক্রিস্টা রেনেটি,
বেকায়দায় পেয়ে অসহায় এক বিদেশিনী ট্যুরিস্টের ওপর
পাশবিক অত্যাচার করে বসলো ইঞ্জিনিয়ার সালে মোহাম্মদ,
প্রেমিককে দিয়ে নিজ স্বামী সামাদ কনট্রাক্টরের গলা
দু'ফাঁক করে দিল জয়গুন বিবি,
নিজ স্ত্রী তার প্রেমিককে এক বিছানায়
বেসামাল অবস্থায় পেয়ে স্রেফ খুন করে ফেললো এক সৈনিক,
ফুসলিয়ে তরুণী নাহারের সর্বনাশ ঘটিয়ে
বিবাহ দণ্ডে দণ্ডিত হলো তরুণ আফতাব—
এমনি আরও অনেক নাটক, অনেক সত্য-ঘটনা,
যা কল্পনাকেও হার মানায়।
এ বই সবাইকে অন্যায় থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে,
আইনের শাসন ও অপরাধের পরিণতি সম্পর্কে
সচেতন করে তুলবে। দেখে শেখা বুদ্ধিমানের কাজ।

কাঠগড়ার মানুষ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

কয়েকটি চাঞ্চল্যকর মামলার সত্য বিবরণ

মোঃ মুমিনুর রহমান

Mamun Academy

মানুষের কাছে গল্প করার মতো
অনেক মুখরোচক বিষয় রয়েছে এতে।
বেচারী নাসিমার ভুল হয়েছিল, প্রেমে পড়েছিল সে
লাহোরের এক নামকরা সিনেমা হল-মালিকের
ছেলের সাথে।···ডাকাতি করতে গিয়ে একটা হাত হারালো কালু।
তারপর ? দলের আর সবাই যে এখন ওকে
খুন করে গুম করে ফেলতে চায় !···
স্বামীকে কয়েক টুকরো করে কেটে
উপহারের লাল-নীল কাগজে মুড়ে গাড়ির
পেছনের সীটে রেখে গাড়ি চালাচ্ছিল এক
উদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী রমণী। গাড়িটা গেল নষ্ট হয়ে।···
মতিঝিল স্টেটব্যাঙ্ক কলোনীতে ১৩ বছরের ছেলে
আক্তারের চোখের সামনে তার ঘুমন্ত পিতাকে
খুন করলো তার মা ও তার লজিং মাস্টার।
এমনি আরও অনেক চমকপ্রদ সত্য ঘটনা।

দেবী ছিল তাদের দলের মধ্যমণি। অতি চালাক ও সতর্ক এই মহিলা কোনো গ্রামে রাত্রি যাপন করতো না। তার গায়ের রং ছিল পাকা গমের মতো। মুখটা একটু লম্বা। খুব সুন্দরী না হলেও তার তন্বী শরীর ও বব কাটা চুল অনেক পুরুষেরই মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। তার মতে ফুলনকে দেখে নিষ্ঠুর বলে মনে হতো না। দুটো জিনিস তার খুব প্রিয় ছিল—চুলে লাল ফিতা বাঁধা ও হাতে ব্যাগ ধারণ করা। কালো রঙের পোশাক ছিল তার প্রিয়, আর বাদাম ছিল তার প্রিয় খাদ্য। রাতের বেলা প্রতি ঘণ্টায় প্রহরী বদল হতো। রাত্রে আটক ব্যক্তির সঙ্গে দলের অন্য সদস্য থাকতো। কেবল ফুলন ও তাঁর প্রেমিক মানসিং অন্যত্র আলাদা ভাবে ঘুমাতো। বন্দী অবস্থায় তার সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহার করা হয় ও প্রয়োজনীয় খাবার দেয়া হয়।

২৭শে মার্চ ডাকাত দলের সঙ্গে পুলিশের আর এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। ঐ দিন পুলিশ খবর পেল যে 'সেমি' গ্রামে ডাকাতেরা ডাকাতি করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর একজন দারোগা ও ৫ জন সিপাহীর এক দল ঐ গ্রামে পৌঁছলো প্রায় তিনটের সময়। পৌঁছেই তারা শুনলো যে লালারাম ও শ্রীরামের ডাকাত দল ঐ গ্রামে কিছু আগেই এসেগেছে। তারা কোথায় লুকিয়ে আছে তা বের করার জন্য পুলিশ গ্রামের বাড়িগুলি তল্লাশি শুরু করলো। পুলিশ যখন বানোয়ারীর বাড়িতে এসে ওদের ঘরের বন্ধ দরজা খুলে ফেললো, তখন সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে তাদের ওপর গুলি বর্ষণ করা হলো। সাব-ইন্সপেক্টর ভূড়ীলাল গুলি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। ইন্সপেক্টর কালীরাম ও কনস্টেবল ইন্দ্রমিতও গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেল। এর পরই ডাকাতেরা মৃত পুলিশদের দুটো

রাইফেল ও ৫০ রাউণ্ড গুলি নিয়ে ওখান থেকে পালালো।

বেহামী হত্যাকাণ্ডের পর উত্তর ও মধ্য প্রদেশের পুলিশবাহিনীর ডাকাতদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযানের ফলে একে একে এই এলাকার ডাকাত বাহিনীর একটি বিরাট অংশ নির্মূল করা হয়। সমগ্র পুলিশ বাহিনীকে এভাবে ক্ষেপিয়ে নেয়ার জন্য বেহামী হত্যাযজ্ঞের নায়িকা ফুলনকেই অন্য ডাকাতেরা দায়ী করতো। স্বভাবতই তারা চাইতো যে ফুলন পুলিশের হাতে ধরা পড়ুক, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশী তৎপরতায় ভাটা পড়বে। ক্রমে ক্রমে ফুলন দেবীরও কয়েকজন অনুগত ডাকাত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং নিহত হয়। কিন্তু এত চেষ্টা করেও তারা ফুলন দেবীর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি। অনেকে বিশ্বাস করতে শুরু করলো 'মা কালীর' আশীর্বাদ ধন্য ফুলন দেবী যাদু জানে, তাকে ধরা সম্ভব নয়।

হ্যাঁ, তবে শেষ পর্যন্ত এহেন ফুলন দেবীরও হার মানতে হলো। ফুলন অভিযানের দীর্ঘ দুই বৎসর পর ১৯৮৩ সালের এপ্রিলের প্রথম দিকে মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ অর্জুন সিং এর নিকট প্রস্তাব পাঠান হয় যে ফুলন দেবী কয়েকটি শর্তে তার সমগ্র দলবল ও অস্ত্রাদি সহ তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি আছে। সরকার এ প্রস্তাব মেনে নিল। মনে হয় ডাকাত মালখান সিং এর আগ্রহ ও মাধ্যমেই এই আত্মসমর্পণের কাজ এগিয়ে যায়।

অবশেষে ১৯৮৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী সেই বহু প্রতীক্ষিত দিন এলো। ঐ দিন বিন্দ-এর এক স্কুল ভবনে বিশেষভাবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। বিপুল জনতার সমাগম হয় ডাকাতির ইতিহাসের চির স্মরণীয় এই অনুষ্ঠান দেখতে। সমাগত অনেকেরই কিন্তু সন্দেহ ছিল শেষ পর্যন্ত ডাকাতেরা সেখানে আসবে কিনা।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি অর্ডার যোগে ৫০'০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা বা শুধু অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

বিদেশে বই পাঠাতে হলে

আমাদের মাধ্যমে বিদেশে প্রবাসী বন্ধু বা আত্মীয়র কাছে সেবা প্রকাশনীর যে কোনো একটি বই পাঠাতে হলে আপনার খরচ পড়বে মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ২৭.০০ টাকা, ইউরোপের জন্য ২৯.০০ টাকা ও আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার জন্য ৩৫.০০ টাকা। মানি অর্ডার ফর্মে নিজের ও বই প্রাপকের নাম ঠিকানা এবং বইটির নাম পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখবেন।

Mamun Academy

'বল, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার।'

—আল-কোরআন

'আল্লাহ্ মানদণ্ড স্থাপন করেছেন যাতে তোমরা ন্যায়-বিচারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার হেরফের না কর, এবং অবিচলিতভাবে ন্যায়নীতি অনুসরণ কর ও তাতে কোন ত্রুটি না ঘটাও।'

—আল-কোরআন

তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে, যদিও তাহা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে অথবা তোমাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে যায়।'

আল-কোরআন

Mamun Academy